কালো চোখের তারা

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার দিদিমণি

৺বিজলীপ্রভা দেবীর

স্মরণে।

প্রস্তাবনা

খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়।

আমি তখন স্কুলে পড়ি। খেলার মাঠে আমার বিশেষ সুনাম ছিল। বই পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল না আমার মোটেই। ক্লাসের বইগুলো নেহাত না পড়লে নয় তাই সেগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যাওয়ার একটা অভ্যাস রেখেছিলাম মাত্র। অথচ দেখতাম সময় পেলেই বাড়ীর সকলে যে যার ঘরে বসে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতেন। আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁদের ধৈর্যের কথা ভাবতাম। ভাবতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি এত তাঁরা পড়েন।

এই সময়ই মা একদিন আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, আমি গল্পের বই পড়ি না কেন? বেশ দৃপ্ত কণ্ঠেই আমি উত্তর দিয়েছিলাম, গল্পের বই পড়লে কি হয়? ক্লাশে পাস করা যায় কি?

আমার উত্তর শুনে ত মা হতভম্ব। এরপর তিনি আমাকে অনেক কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন নিজের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে গেলে ভাল লেখকের গল্পের বই, জ্ঞান বিজ্ঞানের বই, মনীষীদের জীবনী ইত্যাদি পড়া বিশেষ প্রয়োজন। তিনি শেষে বলেছিলেন, এই যে তোমার জ্যাঠামণি এত বই লেখেন। লোকে সেই সব বই মন দিয়ে পড়ে কেন? তাঁর বিরাট জ্ঞান আর প্রতিভার স্বাক্ষর তাতে আছে বলেই না—।

এরও কিছুকাল আগে দেখতাম জ্যাঠামণিকে একাগ্র মনে পাতার পর পাতা লিখে যেতে। সে বয়সেই অবশ্য আমি জানতাম, আমার জ্যাঠামণি শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর সৃষ্টি "ব্যোমকেশ" বাংলা-সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র।

স্থির করলাম, মাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে আমিও গল্প লিখব। যে সে গল্প নয়, গোয়েন্দা গল্পই। লিখলামও। গল্পের নাম "লালরক্ত"। মা গল্পটি পড়ে গল্প লেখা খাতাখানা এমন একটা উঁচু আলমারির মাথায় তুলে রাখলেন যার নাগাল পাওয়া তখন আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশ্য এখন পেয়েও খাতাখানা নামিয়ে আনার কথা মনে পড়ে না। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আমি শেষ পর্যন্ত লেখায় হাত দিয়েছি। নানা পত্র পত্রিকায় লিখছি—কিন্তু আজো "লালরক্তের" কথা মন থেকে মুছে

যায়নি। তাই জীবনের প্রথম লেখার জের টেনেই বোধহয় বার বার গোয়েন্দা গল্প নিয়েই সকলের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছি। আমার লেখা পাঠক-পাঠিকার মনকে পরিতৃপ্ত করছে কিনা বলতে পারি না। তবে আমার সৃষ্টি বিন্দুমাত্র যদি কারুর মনে রেখাপাত করে থাকে, তাহলে তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও "বসুমতীর" সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক মহাশয়। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে সাহিত্যের আসরে নামতে সাহসী করেছেন। আমার প্রথম গল্পটি তাঁর বিখ্যাত পত্রিকায় স্থান দিয়ে আমাকে আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত করে রেখেছেন। তাই আজকের এই পরমলগ্নে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই আমার প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার নেপথ্যে একটি ছোট্ট কাহিনী আছে। উদার হৃদয়ের কাহিনী। শক্তিমান সাহিত্যিক শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশকের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে অসীম কৃতজ্ঞতায় আমাকে নমিত করে রেখেছেন। তিনিও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আমাকে পাঠক সমাজের কাছে সুপরিচিত করা ও আমার প্রচারের ব্যাপারে "রোমাঞ্চ"র সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীরঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও "গোয়েন্দা"র পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীরবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতা অতুলনীয়। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

শ্রীসুখেন্দু মজুমদার একটি স্মরণীয় নাম। শ্রীগুরুর এই তরুণ পরিচালকটি তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যবহারে আমাকে স্তম্ভিত করেছেন। আমার মত একজন সাধারণ লেখকের বই প্রকাশের ব্যাপারে তিনি যে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন তা অভূতপূর্ব। তাঁকেও গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি উৎসর্গ করলাম আমার পিতামহী স্বর্গীয়া বিজলীপ্রভা দেবীকে। উনবিংশ শতাব্দীর এই পুণ্যশ্লোকা মহিলাটি আমার সর্ব শ্রেণীর লেখার একনিষ্ঠা পাঠিকা ছিলেন। তিনি উত্তম সমালোচক ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। আজ বারংবার তাঁর কথা মনে জাগছে। তিনি নেই। প্রার্থনা করি তাঁর আত্মা অমর লোকে পরম শান্তিলাভ করুক।

ব্যানার্জ্জী লজ্ — কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাভূষণ ব্যানার্জ্জী রোড.

মুঙ্গের

বৃষ্টি হচ্ছে।

ঝমঝম শব্দে একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

কাচের শার্শির মধ্যে দিয়ে বাইরের ঝাপসা প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আছে চম্পা। জলে ভেজা, দ্রুত সরে-যাওয়া প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও প্রাকৃতিক শোভায় ডুবে যায়নি ও। সে আনমনে ভাবছে—কত কী ভাবছে। আকাশ পাতাল। আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের ছোট একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা।

চম্পা অবশ্য একাই নেই কামরায়। আরো পাঁচজন যাত্রী রয়েছেন। দুজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ। সকলেই অবাঙ্গালী।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে আপার ইণ্ডিয়া।

গত রাত্রে যখন শেয়ালদায় ট্রেন ধরতে আসে চম্পা, তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। এখনও সে বৃষ্টির বিরাম নেই। এক এক সময় ও নিজেই অবাক হচ্ছে। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি চম্পা, হঠাৎ এই ভাবে ওকে প্রায় তিনশ' মাইল পথ পার হতে হবে। কারণ গত পনের বছরের মধ্যে কলকাতা থেকে এক পা বাইরে যাওয়ার সুযোগ ওর হয়নি। পনের বছর আগেও যে খুব বেশীদূর গিয়েছিল তা নয়—গিয়েছিল মামার বাড়ী কৃষ্ণনগর। তখন অবশ্য মা বেঁচেছিলেন।

সশব্দে নিশ্বাস ফেলে চম্পা। জানলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকায়, আটটা দশ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জামালপুর স্টেশনে ট্রেন ইন করবে।

জামালপুর।

যদিও জামালপুর ওর গন্তব্যস্থল নয়, ও যাবে মুঙ্গের।

মুঙ্গের নামটার সঙ্গে চম্পা পরিচিত ইতিহাসের মাধ্যমেই। মীরকাশিম যখন বাংলার মসনদে, মুঙ্গের তখন বাংলা-বিহারের রাজধানী ছিল। স্কুল জীবনে একথা ইতিহাস পড়ার পর চম্পার মনে এক এক সময় উদয় হয়েছে, মুর্শিদাবাদের এতদূরে বিহারের ওই ছোট্ট শহরেই বা মীরকাশিম নতুন করে রাজধানী পত্তন করতে গেলেন কেন?

সেই মুঙ্গেরে যাবার আহ্বান যে ওর কাছে একদিন আসবে— কল্পনারও অতীত ছিল চম্পার। নিজের ছোটবেলাকার কথা ভাল করে মনে পড়ে না। সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ও শুধু মাকেই দেখে আসছে নিজের পাশে। তিনি ওকে ঘিরে রেখেছিলেন গভীর মমতা দিয়ে।

চম্পা তখন ম্যাট্রিকে পড়ে। মা কাজ করেন একটি মহিলা-কেন্দ্রের সেলাই বিভাগে। অতি সামান্য আয়। সংসারের অভাব সে আয়ে পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। তবে হাজার অনটনের মধ্যেও মা তাকে যতদূর সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করতেন, একথা পরিষ্কার মনে আছে চম্পার। তবু মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন, তোর কী এত কষ্ট পাবার কথা! সবই আমার ভাগ্য।

চম্পা অনেক সময় প্রশ্ন করত, তুমি বার বার একথা কেন বল মা?

মা এড়িয়ে যেতেন প্রশ্নটা। যা হোক একটা কিছু বলে উঠে চলে যেতেন অন্যত্র কোথাও

এইভাবেই কোনক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে দিন কাটছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে প্রবাহও বজায় থাকল না। ঝড় উঠল যেন। কাল বৈশাখীর ঝড়। আর ঝড়ের তাণ্ডব চম্পার জীবনের সমস্ত কিছুকে ছত্রাকারে ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

ম্যাট্রিকের ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল।

আজই ছিল তার শেষ দিন।

চম্পা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরে এল তিনটের পর।

মা বাড়ী নেই। পাঁচটার আগে তাঁর ফেরার কথাও নয়। চম্পা সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এক-নাগাড়ে কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা দিয়ে ও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে ওর তন্দ্রা টুটে গেল। এখন আবার কে এল? মা কী—! ও তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দরজাটা গিয়ে খুলে দিল।

দরজার সামনে একটি দারোয়ান শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে। চম্পা বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

লোকটি বলল, আপনার নাম কি চম্পা চ্যাটার্জ্জী ?

—হ্যাঁ। কেন ?

—আমি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে আসছি।

চম্পা আশ্চর্য কণ্ঠে বলল, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ! কিন্তু···

—আপনার নামে একটা চিঠি আছে।

একটা ভাঁজকরা কাগজ লোকটি ওর হাতে দিল।

কাঁপা হাতে কাগজের ভাঁজ খুলে দ্রুত চিঠিখানা পড়ে ফেলল চম্পা। এ কী ! ···মা !! ···মা'র য়্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে—!!!

মাত্র মিনিট দশেক হল শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে চম্পা।

হাসপাতালে জীবিত অবস্থায় মাকে ও দেখতে পায়নি। ওর পৌঁছাবার মিনিট কুড়িক আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

সার্কুলার রোডে বাস থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন তিনি। আঘাত গুরুতর হয়েছিল। তবে জ্ঞান ছিল শেষ পর্যন্ত তাঁর। চম্পাকে দেখবার এক গভীর ব্যাকুলতা তিনি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করেছিলেন।

চম্পার চোখে জল নেই। পৃথিবীতে মাকে ছাড়া আর কাউকে সে নিজের বলে জানত না। তবু ওর চোখে জল নেই। গভীর শোকে নিজের অসহায়তার কথা চিন্তা করে পাথর হয়ে গেছে চম্পা।

আনন্দবাবু এলেন। আনন্দ রায়—বাড়ীওয়ালা। প্রকৃত ভদ্রলোক তিনি। আজ-কালকার দিনে এরকম বাড়ীওয়ালা বড় একটা দেখা যায় না।

চম্পার মাথায় হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন; এই শোকে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা আমার নেই মা। তবে···

—আমি···আমার কি হবে কাকাবাবু ?

—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমার সাধ্য থাকলে এর সমাধান এখুনি হয়ে যেত। কিন্তু—তোমার মামা রয়েছেন। আমার মনে হয় তোমার এখন কৃষ্ণনগর চলে যাওয়াই উচিত।

কৃষ্ণনগরে যেতে হল না চম্পাকে।

পরের দিন মামা এলেন। বোনের মৃত্যুতে, শোকের দু'চারটে বাঁধা-গৎ আওড়াবার পর তিনি নিজের মনের আসল কথাটা প্রকাশ করলেন।

তিনি চম্পাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারলে আনন্দিত হতেন। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। একে অভাবের সংসার তার ওপর দুটি বয়স্থা কন্যা এখনও অবিবাহিতা। তাদের পাত্রস্থ করবার জন্যে তিনি হন্যে কুকুরের মত চারিদিক চষে বেড়াচ্ছেন। কাজেই অনূঢ়া ভাগ্নীর ভার গ্রহণ করে তিনি আর নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে চান না। ইত্যাদি—

মামা চলে যাওয়ার পর অবশ্য চম্পাকে সত্যিই ভেসে বেড়াতে হয়নি। হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও আনন্দবাবু তাকে নিজের পরিবার-ভুক্ত করে নিয়েছেন। এ অনুগ্রহটুকু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না চম্পার।

লেখাপড়ায় ও খারাপ নয়। মেধাবিনী ছাত্রী হিসেবে স্কুলে ওর সুনাম ছিল। তাই ম্যাট্রিকের দরজা ও সহজেই পার হয়ে এল। আনন্দবাবু একটা কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন ওর। কাজ হল একজন ধনী রুগ্ন বৃদ্ধের সঙ্গদান করা—তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, খবর-কাগজ পড়ে শোনানো, তাঁর হয়ে চিঠি লিখে দেওয়া, খুচরো ফাইফরমাশ কিছু খাটা ইত্যাদি—।

মাসিক দক্ষিণা পঞ্চাশ টাকা।

এই ব্যবস্থায় আনন্দিত হয়েছে চম্পা। আনন্দবাবুর সংসারে কিছুটা সাহায্য অন্তত করতে পারবে, এতেই আনন্দিত।

এরপর কেটে গেছে কয়েক বছর।

পনের বছরের চম্পা এখন উনিশ বছরের।

নানা ওঠা-পড়ার মধ্যে কখন ঝিমিয়ে আবার কখন দ্রুততালে এগিয়ে এসেছে ওর জীবন প্রবাহ। একটানা চার বছর এইভাবে কাটার পর ওর দ্রুত চলমান জীবন-প্রবাহ হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থেমে পড়েছে সম্প্রতি।

মাসখানেক ধরে বেকার বসে আছে চম্পা। প্রচুর সন্ধান করেও একটা কাজের জোগাড় ও করে উঠতে পারছে না। অথচ এর আগে একটা কাজ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কাজ পেয়েছে কত তাড়াতাড়ি। অনেক সময়ে লোকে বাড়ী বয়ে এসে ওকে কাজে নিযুক্ত করে গেছে। কিন্তু এখন—তাই ভাবছে চম্পা।

আনন্দবাবুর অভাবের সংসার উপস্থিত আরো অভাবের ভারে নুয়ে পড়েছে। চারটে ছোট ছোট ঘর তিনি ভাড়া দেন—কয়েক মাসের ভাড়া ভাড়াটে বাকি রেখেছে। আনন্দবাবুর চাকরী জীবনের এই হল শেষ মাস। আসছে মাসে তিনি রিটায়ার করবেন। ওর চাকরীটাও গেল ঠিক সময় বুঝেই।

কাজেই চিন্তার শেষ নেই চম্পার।

ওর চরম বিপদের দিনে আনন্দবাবু ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন—আজ তাঁর দুর্দিনে চম্পা তাঁকে সাহায্য করতে পারছেন না, এটা কী কম পরিতাপের বিষয়!

দরজার কড়া নড়ে উঠল এই সময়।

ও উঠে গিয়ে দরজা খুলল। একটি যুবক দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই যুবকটি বলল, আনন্দবাবু বাড়ী আছেন?

—তিনি এখনও অফিস থেকে ফেরেননি। আপনার তাঁকে কিছু বলবার থাকলে আমায় বলে যেতে পারেন।

—প্রয়োজন ঠিক তাঁর সঙ্গে নয়। যুবকটি বলল, চম্পা চ্যাটার্জ্জী নামে যে মহিলাটি এখানে থাকেন—

—বলুন! আমিই—

—ও, আপনি। আমি মিত্র য়্যাণ্ড রে য়্যাটর্নি অফিস থেকে আসছি।

য়্যাটর্নি অফিস থেকে! চম্পা বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ে। —কি ব্যাপার বলুন ত?

—কাল তুপুরে আপনাকে একবার আমাদের ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিটের অফিসে যেতে হবে।

—আমাকে? কেন?

—আমি ঠিক বলতে পারব না। এই যে, অফিসিয়াল চিঠিটা নিন। কাল তুটোর পর গেলেই আমাদের সুবিধা হবে।

যুবকটি ওর হাতে মুখবন্ধ একটি খাম দিয়ে বিদায় নিল।

আনন্দবাবু আজ আর অফিস গেলেন না।

চম্পাকে নিয়ে য়্যাটর্নি পাড়ায় এলেন তুটোর পর।

চম্পার মত তিনিও কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছেন না, হঠাৎ এই য়্যাটর্নি অফিস থেকে আহ্বানের। ঠিকানা খুঁজে বার করতে খুব কষ্ট হল না ওঁদের।

একটি বিরাট বাড়ীর অসংখ্য ঘরে নানা ধরনের অফিস।

দোতলার দক্ষিণ প্রান্তের চারখানা ঘর নিয়ে মিত্র য়্যাণ্ড রে।

শ্লিপ পাঠাতেই সিনিয়ার পার্টনার মহীতোষ মিত্র স্বয়ং এসে চম্পা ও আনন্দবাবুকে নিজের চেম্বারে নিয়ে গেলেন। বসতে অনুরোধ করলেন। চা এল তারপর।

মিঃ মিত্র বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন, আপনাদের এভাবে হঠাৎ ডেকে পাঠাবার জন্য?

আনন্দবাবু বললেন, অবাক হবার কথা বৈকী!

—আমি আমার এক বিশিষ্ট মক্কেলের অনুরোধেই আপনাদের আহ্বান করেছি।

—মক্কেল! তিনি কে?

—আমি বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা। মিঃ মিত্র বললেন, এখান

থেকে ২৮৬ মাইল দূরে বিহারের একটি শহর আছে, নাম তার মুঙ্গের।

—জানি। মীরকাশিমের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল। চম্পা বলল।

—ঠিকই বলেছেন। সেখানে আমার এক মক্কেলের বার্ষিক দু-লক্ষ টাকা আয় বিশিষ্ট এক সম্পত্তি আছে। তিনি আমায় লিখিত ভাবে আদেশ দেন, তাঁর মৃত্যুর পর যখন উইল পড়া হবে তখন যেন ৺ দেবনারায়ণ চ্যাটার্জ্জীর কন্যা চম্পা চ্যাটার্জ্জী সেখানে উপস্থিত থাকেন।

চম্পা অবাক দৃষ্টিতে মিঃ মিত্রের মুখের দিকে তাকায়।

আনন্দবাবু বললেন, আপনার মক্কেলের নাম জানতে পারি?

—নিশ্চয়ই। রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

—তিনি কি মারা গেছেন?

—আমার মক্কেল মারা গেছেন মাস দুয়েক আগে।

চম্পা নিজের বিহ্বল ভাবটা দমন করে এবার বলল, কিন্তু আমি তো এ নামে কাউকে চিনি না। তাঁর উইল পড়ার সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকব কেন?

চোখ থেকে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে মহীতোষ মিত্র বললেন, কেন'র উত্তরটা উইল পড়ার পরই পাওয়া যাবে।

—আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কি ভাবে?

—আপনার মামার বাড়ীর ঠিকানা আমার কাছে দেওয়া ছিল। ওখান থেকেই আমি আপনার বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।

—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—একজন অপরিচিত ধনী ভদ্রলোক আমাকে....আমাকেই বা···আচ্ছা, আমি ইচ্ছে করলে তো নাও যেতে পারি?

—যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। তবে আমার মতে না যাওয়াটা যুক্তি সঙ্গত হবে না। যাই হোক, এই আপনার পরিচয়-পত্র রইল। যাওয়ার মনস্থ করলে কালকের

রাত্রের ট্রেনে রওয়ানা হবেন।

আনন্দবাবু প্রশ্ন করলেন, কবে উইল পড়া হবে?

—আগামী সোমবার, অর্থাৎ আজ থেকে চারদিন পরে উইল পড়া হবে।

টেবিলের ওপর থেকে খামে মোড়া পরিচয়-পত্রটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চম্পা। আনন্দবাবুও।

তারপর নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল দুজনে:

* * * *

অনেক রাত্রি অবধি ঘুমতে পারল না চম্পা।

রাজ্যের চিন্তা ওকে কুরেকুরে খেয়ে চলেছে। কোথাকার মিলওনিয়ার রাজনারায়ণ চ্যাটার্জ্জী মারা যাবার আগে ওর সম্বন্ধে এই রকম অদ্ভুত নির্দেশই বা দিয়ে গেছেন কেন?

চম্পা এ নাম আগে কোনদিন শোনেনি। এমনকি মাও ওকে বলেননি কোনদিন।

কে এই রাজনারায়ণ?

বিছানায় উঠে বসল চম্পা। এরকম ঘটনা উপন্যাসেই পড়া যায়। নায়িকাদের জীবনেই এই রকম চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে থাকে। ও কী উপন্যাসের নায়িকা হয়ে উঠল!

বিছানা থেকে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল চম্পা।

বৃষ্টি হচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেই একটানা হয়ে চলেছে বৃষ্টি। রাস্তায় বেশ জল জমেছে। ছপ ছপ করে শব্দ তুলে একটা কুকুর জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আহারের সন্ধানেই তাকে এই বৃষ্টি মাথায় করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে হয়তো।

চম্পা জানলার গরাদ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হ্যাঁ, ও যাবে মুঙ্গেরে। রাজনারায়ণ চ্যাটার্জ্জী যতই তার অপরিচিত হোন না কেন. তবু…। অন্তত কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যেই যাবে।

পাশের ঘরের ঘড়িতে সশব্দে তিনটে বাজল। চম্পা জানলা

বন্ধ করে বিছানার দিকে ফিরে চলল। এবার একটু ঘুমের আরাধনা করা উচিত।

আনন্দবাবু কিন্তু মুঙ্গের যেতে রাজী হলেন না।

য়্যাটর্নি মহীতোষ মিত্র চম্পাকেই মুঙ্গেরে যেতে বলেছেন, সে ক্ষেত্রে—। আত্মমর্যাদাশীল এই লোকটির মনের ভাব বুঝতে চম্পার কষ্ট হয় না। কাজেই একাই রওয়ানা হতে হল ওকে।

ট্রেনে বিশেষ ভিড় ছিল না। বৃষ্টির মাতামাতির জন্য অনেকেই নিজের যাত্রা স্থগিত রেখেছে কিনা বলা শক্ত। তবে···

প্রবল শব্দে চটকা ভাঙ্গল চম্পার। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল ও। কাচের শার্শির দিকে চোখ ফেরাতেই ও দেখল, ট্রেন তখন একটা টানেলের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

॥ এক ॥

মুঙ্গেরের প্রতিষ্ঠা মহাভারতের যুগেই।

তখন অবশ্য এই শহরটির নাম ছিল মুদ্গলপুর। কথিত আছে মহাবীর কর্ণ নিজের রাজধানী থেকে মাসের মধ্যে কয়েকবার এখানে আসতেন, মুক্তহস্তে জনসাধারণকে অর্থদান করবার জন্যে। যে বিশেষ জায়গাটিতে বসে কর্ণ দান করতেন, তা এখন কারণচৌড়া (কথাটা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এই রকম রূপ নিয়েছে—) নামে প্রসিদ্ধ।

পরবর্তীকালে মুঙ্গেরের বুকের ওপর দিয়ে অনেক রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন সাজাহান।

স্থবির ভারতসম্রাট সাজাহান। প্রজাপালক হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসে যে অক্ষরেই লেখা থাক না কেন—পারিবারিক ক্ষেত্রে তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে যদি একটু দৃঢ়তা প্রকাশ করতেন তাহলে ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হত।

সবে আরম্ভ হয়েছে ভায়ে ভায়ে হানাহানি।

আওরাংজেবের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে ক্রমেই।

সুজা সসৈন্যে মুঙ্গেরে এসে উপস্থিত হলেন। নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তিনি এখান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। তারপর—

তারপর আবার ঐতিহাসিক পর্দা স্মরণীয় ভাবে উত্তোলিত হল নবাবী আমলে। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে মীরকাশিম মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে তুলে এনেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এখানে রাজত্ব তিনি করতে পারেননি। ইংরেজদের দুর্বার গতিকে ঠেকিয়ে রাখার মত শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি·········

এরপর কেটে গেছে বছরের পর বছর।

অনেক ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসকে পেছনে ফেলে মুঙ্গের আজ নিটোল রূপ নিয়েছে। এখন আর নেই কোন হানাহানির আতঙ্ক। সুন্দর ছবির মত শহরের সুনাম আজ সর্বত্র।

হাজার দুয়েক বাঙ্গালী এখানে বাস করেন। সকলেই বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন। নিজেদের বাড়ী আছে প্রায় সব পরিবারেরই। তবে মুঙ্গেরে পা দেওয়ার পরই প্রথমেই যে বাড়ীখানা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার বৈভব বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী দুই মহলেরই সমস্ত ঐশ্বর্যকে ম্লান করে দিয়েছে।

এই বাড়ীখানি 'রাজনারায়ণ লজ' নামেই বিখ্যাত। দেড়বিঘা জমির উপর এই তেতলা বাড়ীটার কোথাও কণামাত্র আধুনিকতার ছাপ নেই। সেকালের হর্মশিল্পের ঐতিহ্য নিয়ে একালেও বিরাট দৈত্যের মত বাড়ীখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন।

বাড়ীর মালিক রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শুধু বিরাট ধনীই ছিলেন না—সামাজিক বহুতর কাজে উৎসাহদাতা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল।

সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন।

মুঙ্গেরের মত শহরে এই ধনী লোকটি কীভাবে গিয়ে উপস্থিত

হয়েছিলেন, তার একটা ইতিহাস আছে। রাজনারায়ণ প্রথমে এখানে আসেননি, প্রথমে এসেছিলেন তাঁর ঠাকুর্দা। পুরুতের কাজ করে আর নিজের পেট ভরাতে না পেরে, প্রায় ৭৫ বছর আগে বাংলাদেশের বারুইপুর থেকে নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ভাগ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। এবং হাঁটাপথে বিহারে এসে গিধোড় রাজ এস্টেটের সেরেস্তায় চাকরী পান।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন নরনারায়ণ পরিবর্তীকালে প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। দৈবাৎ কোন একটি বিশেষ কাজের জন্যে কুমার বাহাদুরের দৃষ্টিতে তিনি পড়েন। উন্নত ভাগ্যের সূত্রপাত এখানেই।

মৃত্যুর সময় নরনারায়ণ কয়েক লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র পুত্র রায়নারায়ণ অর্থের অঙ্ক এক কপর্দক বাড়াতে পারেননি। বরং মদের স্রোতে সমস্ত অর্থ বইয়ে দিয়েছিলেন বছর কুড়িকের মধ্যেই। মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত তাঁকে হারাতে হয়েছিল।

কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র রাজনারায়ণ ছিলেন নরনারায়ণের মতই সংযত চরিত্রের। তিনি শোচনীয় পারিবারিক অবস্থা দেখে, অতি অল্প বয়সেই অর্থের সাধনায় ব্যাপৃত হলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ করেননি রাজনারায়ণকে। টিম্বারের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি উপার্জন করেছেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি কাঠের ব্যবসা তুলে দিয়েছিলেন। বিরাট জমিদারী কিনেছিলেন—নিজেই সমস্ত দেখাশুনা করতেন। আজ যদিও রাজনারায়ণ নেই, তবে 'রাজনারায়ণ লজ' আছে।

আমাদের ফেলে আসা গল্পের খেই আবার এখান থেকে ধরতে হবে।

ঢং ঢং শব্দে কোথায় ছটা বাজল।

রাজনারায়ণ লজের সকাল হয় একটু বেলায়।

তাই এখন বেশীর ভাগ লোকই যে যার বিছানায়।

শুধু একতলার বাগানের দিকের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। মাঝারি সাইজের ঘরখানি। একটি টেবিলের সামনাসামনি দুটি চেয়ারে দুজন বসে। একজন প্রৌঢ়, অন্যজন যুবক।

এখানে এঁদের পরিচয় দেওয়াটা অনাবশ্যক হবে না।

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি হলেন মৃত গৃহকর্তা রাজনারায়ণবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ চ্যাটার্জ্জী। যুবকটি জয়ন্ত চৌধুরী—রামনারায়ণবাবুর শ্যালক।

সোনার সিগারেট-কেশ থেকে একটা সিগারেট বার করে বললেন রামনারায়ণ, যা বলছিলাম, দাদা ভুগছিলেন ঠিকই, তবে হঠাৎ এভাবে মারা যাবেন ভাবতে পারিনি।

—বয়স হয়েছিল মারা গেছেন, এতে আর আক্ষেপ করবার কী আছে!

—আক্ষেপ ঠিক করছি না। আমার কি মনে হয় জান?

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, বলুন?

—আমার ধারণা দাদা···

—থামলেন কেন, বলুন?

এবার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন রামনারায়ণ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমার ধারণা দাদা সহজভাবে মারা যাননি।

—অর্থাৎ?

—তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে দাদা মুঙ্গেরের বাড়ীতে মারা যাননি। তিনি মারা গিয়েছিলেন এখান থেকে মাইল কুড়িক দূরে, পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা তাঁর জমিদারি লাকাড়কোলায়।

—হ্যাঁ, আমি একথা শুনেছি।

সিগারেটে একটা দীর্ঘটান দিয়ে রামনারায়ণ বললেন, তাঁর মৃতদেহ যখন এখানে বয়ে আনা হয় তখন আমি প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁকে—

—তাঁকে?

—আমি ডাক্তার জয়ন্ত। আমার অনুমান করতে কষ্ট হয়নি,

তাঁকে খুন করা হয়েছে।

—খুন! জয়ন্ত চৌধুরী দ্রুত কণ্ঠে বললেন, আস্তে কথা বলুন। দেওয়ালেরও কান আছে।

চাপা গলায় রামনারায়ণ বললেন, প্রশ্ন উঠতে পারে আমি একথা পুলিসকে কেন জানালাম না! সঙ্গত প্রশ্ন। আমি বলেছিলাম আমার ভাইপো ইন্দ্রকে আমার সন্দেহের কথা।

—তারপর?

—কিন্তু আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ রায় করনারি থ্রম্বোসিস বলে মত প্রকাশ করলেন। ইন্দ্রও আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গটাকে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, যা হবার তা অবশ্য হয়ে গেছে। এখন আর ও বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী। আমায় হঠাৎ তার করে ডেকে পাঠালেন কেন তাই বলুন।

—তোমায় ডেকেছি- এসময়ে আমি তোমার পরামর্শ চাই জয়ন্ত।

—পরামর্শ?

—হ্যাঁ। কাল দাদার উইল পড়া হবে। উইলে যদি আমার ওই বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকে, তাহলে আমার অবস্থাটা কতখানি শোচনীয় হয়ে উঠবে, তা তুমি অনুমান করতে পার?

—তবে আপনার যে বোকামি হয়েছে একথা আমি বলব। এভাবে জড়িয়ে পড়বার কোন মানে হয় না।

—একটা রঙীন স্বপ্ন আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল জয়ন্ত। তবে···

রামনারায়ণের কথা শেষ হবার আগেই দরজায় করাঘাত হল।

তিনি বললেন, কে?

—আমি সুপর্ণ।

—এস, এস—।

দরজার একটা পাল্লা সরিয়ে সুপর্ণ ঘরের মধ্যে এল।

সুঠাম সুশ্রী চেহারা সুপর্ণর। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।

—আমায় ডেকেছেন ?

রামনারায়ণ বললেন, তোমাকে এখুনি একবার জামালপুর যেতে হবে।

—জামালপুর ?

—আপার ইণ্ডিয়ায় কলকাতা থেকে একটি মেয়ে আসছে, তাকে নিয়ে আসতে হবে। সাড়ে আটটায় গাড়ী বোধ হয়।

ইতস্তত করে সুপর্ণ বলল, কিন্তু আমি তো মহিলাটিকে চিনি না। কী ভাবে—

—গেলে ঠিকই চিনতে পারবে। দেখবে কোন বাঙ্গালী মেয়ে স্টেশনে অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কীনা, তাহলেই—হেসে কথাটা শেষ না করেই চুপ করলেন রামনারায়ণ।

সুপর্ণ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, কে আসছে ?

—দেবনারায়ণের মেয়ে।

—অর্থাৎ আপনার দাদার বড় ছেলে দেবনারায়ণবাবুর মেয়ে! তিনি বিয়ে করেছিলেন না কি ?

—হ্যাঁ, বিয়ে সে করেছিল।

—কই আমি তো শুনিনি। আমি জানতাম তিনি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করার পরই কোন অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন।

নিরুত্তাপ গলায় রামনারায়ণ বললেন, সাধারণ লোকে তাই জানে বটে। আসল ব্যাপারটা দাদা আমাদের চেপে রাখতে বাধ্য করেছিলেন।

—এখন বলতে বাধা আছে ? প্রচুর আগ্রহ নিয়ে জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

—না, এখন আর আপত্তি কিসের। বেশ শোন—

॥ ক ॥

সন্ধ্যা তখনও ঘন হয়নি।

নিজের ঘরে, কোচে বসে আজকের দৈনিকখানায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন রাজনারায়ণ। সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন খবর-কাগজটা পড়ে উঠতে পারেন না। কাজেই সন্ধ্যা বেলাটাই হল উপযুক্ত সময়।

অবশ্য এই সময় তিনি শুধু খবর-কাগজই পড়েন না, চিঠিপত্র-গুলো দেখে নেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন চিঠি থাকলে তার উত্তরটা লিখে রাখেন এই সময়।

এই অবকাশটুকু যদিও তিনি খুব কম দিনই হাতে পেয়েছেন। আগে, স্নেহপ্রভা বেঁচে থাকা কালীন এ সময়ে কিছু করবার উপায় ছিল না। স্নেহপ্রভা কাজের মানুষটিকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে চাইতেন তখন।

বলতেন, কাজ আর কাজ। সারাদিন এত কাজ করেও তোমার কাজের সাধ বুঝি মেটে না বাপু। এখন রাখ দিকী কাগজপত্তর—

রাজনারায়ণ হাসতেন। জোরে হেসে উঠতেন তিনি। স্ত্রীর কথায় কেমন একটা মাদকতা অনুভব করতেন। তিনিও বলতেন, কাজ না করলে পেট চলবে কি করে? বাবা তো রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যাহক—

—জানি গো জানি। তুমি যে একজন কর্মীপুরুষ তা আমার খুব ভালভাবে জানা আছে।

এখনও যেন কথাগুলো কানে বাজতে থাকে রাজনারায়ণের।

স্ত্রীকে তিনি ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় আক্ষেপ।

তাই খবর-কাগজ থেকে মুখ তুলে এখনও বারে বারে তাকান স্নেহপ্রভার বড় অয়েল-পেন্টিংটার দিকে।

এক সময় খবর-কাগজ পড়া শেষ করলেন রাজনারায়ণ। চিঠি-গুলো টেনে নিলেন।

সামনের টিপয়ের উপর একটা ট্রেতে রাখা ছিল সেগুলো। আজকের ডাকে পাঁচখানা চিঠি এসেছে। তার মধ্যে তিনখানাই আবেদন-পত্র। অভাবের তাড়নায় পড়া বন্ধ করে দিতে হচ্ছে বলে, তিনটি ছাত্র তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছে। এ রকম আবেদন-পত্র প্রায়ই পেয়ে থাকেন তিনি। সাহায্যও করেন।

চতুর্থ খামখানা হাতে তুলে নিলেন এবার তিনি। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করে চোখের সামনে তুলে ধরতেই তাঁর ভ্রূ-কুঁচকে উঠল।

চিঠিখানায় লেখা ছিল—

মাননীয় চাটুজ্যে মশাই,

বেশ কিছুদিন চিন্তার পর মনঃস্থির করিয়া আপনাকে পত্র দিতেছি। আপনার নিকট আমি বহুভাবে উপকৃত। সে ঋণ পরিশোধ করিবার সাধ্য আমার নাই। অন্যভাবে আপনার কাজে লাগিতে চাই।

উপস্থিত আপনার বংশ মর্যাদায় হানি ঘটিতেছে, এ রকম একটি ঘটনা আমার দৃষ্টি গোচর হওয়ায়, এই পত্রের অবতারণা।

আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র দীর্ঘদিন আমারই বোডিং হাউসে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে। ধীর শান্ত ও সংযত চরিত্রের যুবক বলিয়া আমি তাহাকে জানিতাম কিন্তু সম্প্রতি তাহার চরিত্রে কিছুটা ব্যতি-ক্রম লক্ষ্য করিতেছি।

আমাব বোডিং হাউসের নিকটেই জনৈক গন্ধবণিক পরিবার একটি গৃহে বাস করেন। তাঁহাদেরই একটি কন্যার সহিত দেব-নারায়ণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে শুনিতেছি।

এই ব্যাপারটি আপনার মর্যাদার সহিত জড়িত থাকায়, ঘটনাটি আপনার কর্ণগোচর করা বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম।

নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

বিনীত

শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্তী।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজনারায়ণ।

সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে দেবনারায়ণ শেষ পর্যন্ত……। একী বিদেশী শিক্ষার ফল! কিন্তু তাঁর রক্ত কী এক বিন্দুও নেই দেব-নারায়ণের দেহে!

বোর্ডিং হাউসটি গড়ে তোলবার সময় বিনোদকে কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন তিনি। বিনোদ তাঁকে এবিষয়ে সচেতন করে দিয়ে ভালই করেছে। রাজনারায়ণ কোচ থেকে উঠে দরজার গোড়ায় এগিয়ে গেলেন।

দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আহ্বান করলেন একটি ভৃত্যকে।

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে তার খাস পরিচারক জাগোয়া এসে দাঁড়াল।

—সরকার মশাইকে এখুনি খবর দাও।

জাগোয়া ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে, রাজনারায়ণ স্নেহপ্রভার অয়েল-পেন্টিংটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মৃদু গলায় বললেন, শুনেছ তোমার গুণধর ছেলের কীর্তি! প্রেম করছেন তিনি।

—আমায় ডেকেছেন বড়বাবু?

রাজনারায়ণ মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, সরকার শ্রীনাথ পাল এসেছেন।

জমিদারী চালাতে গেলে যে ধরনের পক্ককেশ বৃদ্ধ সরকারের প্রয়োজন হয়—শ্রীনাথ কিন্তু সে শ্রেণীর নয়। তাঁর বয়স ২৮।২৯-এর মধ্যেই।

—হ্যাঁ। দেবুকে একটা তার করে দিন। সে যেন তার পেয়েই চলে আসে এখানে।

—যে আজ্ঞে।

দিন তিনেকের মধ্যেই দেবনারায়ণ কলকাতা থেকে মুঙ্গেরে এলেন।

বাড়ীতে পা দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই রাজনারায়ণ ডেকে পাঠালেন তাঁকে।

পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ হল।

দেবনারায়ণও হঠাৎ এইভাবে তার করে ডেকে পাঠাবার কারণটার সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। রাজনারায়ণ মুখে কিছু না বলে বিনোদলাল চক্রবর্তীর চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

চিঠি পড়েই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন দেবনারায়ণ। একটা অদ্ভুত ভয় তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলল। রাজনারায়ণের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ জ্ঞান ছিল।

রাজনারায়ণ গম্ভীর গলায় বললেন, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?

দেবনারায়ণ মনের মধ্যে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করলেও মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

—চুপ করে থাকলে পরিস্থিতি সরল হবে না।

—আপনি কি জানতে চাইছেন?

—চিঠিতে যা লেখা আছে তা সত্যি ?

দেবনারায়ণ নীরব রইলেন।

—চুপ করে যাওয়াটা নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

দেবনারায়ণ ধরা গলায় বললেন, আমি অন্যায় কিছু করেনি।

—ন্যায় অন্যায়ের বিচারক তুমি নও! চীৎকার করে উঠলেন রাজনারায়ণ।—এই ভাবে বংশের মুখে কালি লেপে দিতে তোমার বুক এতটুকু কাঁপল না!

—আমি বংশ-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নি।

—থাম। রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে গুষ্ঠীর সকলকে গালি-গালাজ করলেই শুধু বংশের অমর্যাদা করা হয়—? একটা বেজাতের মেয়ে—না-না, তা তবে না। তুমি যদি মনে করে থাক, আমি ওই মেয়েকে বৌ করে আনব তাহলে তুমি আজো আমায় চিনতে পারনি।

রাজনারায়ণের সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে।

এবার দেবনারায়ণের কণ্ঠে দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। তিনি বললেন,

আপনি প্রাচীনপন্থী আপনার সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে আর আলোচনা করতে চাই না।

—আমার মুখের ওপর এত বড় কথা বলতে তোমার আটকাল না ? হ্যাঁ, আমি প্রাচীনপন্থী—এর জন্যে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। তবে তুমি যদি আধুনিকতা দেখাতে গিয়ে ওই মেয়েটিকে বিয়ে কর, তাহলে আমার শেষ কথা শুনে রাখ, তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার এখানেই শেষ হল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন দেবনারায়ণ। তারপর দ্রুতপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

রাজনারায়ণ ছুটে গেলেন স্নেহপ্রভার অয়েল-পেন্টিংটার দিকে। বললেন ভেজা গলায়, দেখলে, দেখলে প্রভা তোমার ছেলের কাণ্ডটা।

সেদিন বিকেলের ট্রেনেই দেবনারায়ণ কলকতায় ফিরে গেলেন।

রাজনারায়ণের সঙ্গে কোন রকমের কথা তাঁর হল না আর।

এই ঘটনার এক মাস পরে আবার একটা চিঠি পেলেন রাজনারায়ণ।

এখানিও লিখেছেন বিনোদলাল চক্রবর্তী।

তিনি সসংকোচে জানিয়েছেন, দেবনারায়ণ গন্ধবণিক পরিবারের সেই মেয়েটিকে ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করেছেন।

শান্ত ও সংযত ভাবেই সমস্ত ব্যাপারটাকে গ্রহণ করলেন রাজনারায়ণ। এতটুকু রাগ প্রকাশ পেল না তাঁর ব্যবহারে। শুধু তিনি একটা চিঠি লিখে দেবনারায়ণকে জানিয়ে দিলেন, এরপর থেকে ইন্দ্রনারায়ণকেই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করবেন।

॥ দুই ॥

রামনারায়ণ নিজের কাহিনী শেষ করলেন।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, দেবনারায়ণবাবু বোধহয় তারপর আর এ বাড়ীতে আসেন নি ?

—না।

—দেবনারায়ণবাবুর মেয়ে ছিল একথা আপনি আগে জানতেন ?

—না। এখন শুনছি। তবে বিয়ে যখন করেছিল তখন মেয়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

কথাটা শুনে অর্থ-পূর্ণ ভঙ্গীতে হাসলেন জয়ন্ত চৌধুরী।

* * *

বিরাট সরিসৃপের মত আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস জামালপুর স্টেশানে প্রবেশ করল।

ছিমছাম পরিষ্কার স্টেশানটি।

গাড়ী থেকে নেমে এল চম্পা।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই ও চারিদিকে নিজের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। চম্পা অবশ্য আশা করেনি কেউ তাকে নিতে আসবে. তবু—। খুব অল্প সংখ্যক যাত্রীই এখানে নেমেছে। বলতে গেলে ট্রেনটা খালি হয়ে গিয়েছিল ভাগলপুরেই।

চম্পা একটা কুলি ডেকে স্যুটকেশ আর বেডিংটা তুলতে বলল।

কুলি এখানকার চলতি হিন্দীতে জানতে চাইল, ও কোথায় যাবে।

চম্পা বাংলাতেই উত্তর দিল, মুঙ্গের। যাবার কি ব্যবস্থা আছে ?

জামালপুর রেলওয়ে টাউন।

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন বাঙ্গালী। কাজেই এখানকার অবাঙ্গালীদের বাংলা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না।

কুলি বলল, ট্যাক্সি, বাস, রিক্সা সবই আছে। যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই।

—তাহলে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডেই চল।

—আপনি কলকাতা থেকে আসছেন ?

চমকে মুখ ফেরাল চম্পা।

একটি সুদর্শন যুবক তাকেই প্রশ্ন করছে !

ও বিস্মিত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ।

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল যুবকটি, আপনি বোধহয় মুঙ্গেরের রাজ-নারায়ণবাবুর বাড়ী যাবেন ?

চম্পা ঘাড় নাড়ল।

—আসুন। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

—আপনি— ?

—আমি সুপর্ণ ব্যানার্জ্জী। রাজনারায়ণবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলাম।

আসুন, বাইরে গাড়ী অপেক্ষা করছে।

স্টেশানের বাইরে এল ওরা। সুপর্ণার নির্দেশমত কুলি গাড়ীর কেরিয়ারে সুটকেশ আর বেডিংটা রাখল।

ছুটে চলেছে গাড়ীখানা !

চম্পা পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে কত কী ভাবছে। কতক্ষণ কাটল যাহোক ভাবে, এবার কী রকম পরিবেশে গিয়ে পড়বে কে জানে !

সুপর্ণ ড্রাইভারের পাসে বসে আছে। ওর দৃষ্টি বাইরের দিকে নিবদ্ধ। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছে না চম্পা।

দুপাশের মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে গাড়ীখানা।

গাড়ী থেকে নামবার পর সুপর্ণ ই চম্পাকে সঙ্গে করে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে চলল। প্রথমে করিডোর। তারপর কয়েকটি ঘর পার হয়ে এল ওরা।

কিন্তু ড্রইংরুমে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল চম্পা। ঘরের চতুর্দিকে বড় বড় অয়েল-পেন্টিং টাঙ্গান।

ও একটি ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকারই কথা, কারণ ছবিটা ওরই বাবার। এ-বাড়ীতে এ-ছবি এল কী ভাবে !

চম্পা খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে। তবে তাঁর ছবিতো রয়েছে ওর কাছে ! সে ছবির সঙ্গে এই অয়েল-পেন্টিংএর এতটুকু

কোথাও প্রভেদ নেই।

চম্পার ভাব দেখে সুপর্ণও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এই সময় ঘরে এলেন ইন্দ্রনারায়ণ। লম্বায় ছ'ফুটের উপর হবেন ভদ্রলোক। গায়ের রং কালো। চওড়া চোয়াল। রুক্ষ মুখের ভাব। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে।

—কি দেখছ? বাবার অয়েল-পেন্টিং?

ইন্দ্রনারায়ণের দিকে মুখ ফেরাল চম্পা।

তিনি আবার বললেন, অবাক হয়ে ভাবছ, এ ছবিখানা এখানে এল কী করে! তুমি তোমার নিজের বাড়ীতে এসেছ মা।

—নিজের বাড়ীতে!

—হুঁ। আমি তোমার কাকা। কিন্তু এখন আর কথা নয়, তুমি ক্লান্ত, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। এস—

ইন্দ্রনারায়ণ চম্পাকে নিয়ে চলে গেলে, সুপর্ণ নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। দোতলার দক্ষিণ দিকের একটা ঘর ওর জন্যে নির্দিষ্ট আছে।

ঘরে ঢুকে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে ও একটা চেয়ারে বসে পড়ল। সুপর্ণ অবশ্য আর এখানকার বেশীদিনের অতিথি নয়। ও চলে যাবে। রাজনারায়ণবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওর এখানকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ও শুধু অপেক্ষা য়্যাটর্নির নির্দেশের। উইল পড়া অবধি এখানে ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

—সুপর্ণবাবু?

মিত্রানী ঘরে এল।

ইন্দ্রনারায়ণের একমাত্র মেয়ে। এখানকার ডায়মণ্ড জুবিলি কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী।

—বলুন?

—মেয়েটি কে বলুন তো? দেখলাম বাবা ঘটা করে তাকে খাওয়াচ্ছেন।

—কোন্ মেয়েটি?

—কেন, আপনি বুঝতে পারছেন না? যাকে স্টেশান থেকে নিয়ে এলেন, আমি তার কথা বলছি।

—আপনার জেঠতুতো বোন।

—আমার জেঠতুতো বোন!

—তাই তো শুনলাম।

মিত্রানী টেনে টেনে বলল, কই আগেতো শুনিনি আমার কোন জাঠতুতো বোন আছে। আমি তো জানি, আমিই বংশের একমাত্র মেয়ে।

সুপর্ণ কিছু বলল না। জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল।

মিত্রানী আবার বলল, সুপর্ণবাবু, আমার এই বোনটি হঠাৎ উদয় হলেন কোথা থেকে?

—কলকাতা থেকে এসেছেন।

—কিন্তু ও যে সত্যি আমার জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে তার প্রমাণ কি?

সুপর্ণ অল্প একটু হাসল।

—প্রমাণ! এ বিষয় আপনার বাবাই আপনাকে ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে চম্পাকে নিয়ে দোতলায় এলেন ইন্দ্রনারায়ণ।

একটি সুসজ্জিত কক্ষ দেখিয়ে বললেন, এই ঘরে তুমি থাকবে।

চম্পা ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

বেশ বড় ঘরখানা। মেঝে কার্পেট পাতা। মেহগনি কাঠের খাটটা রয়েছে একপাশে। উত্তর দিকে দেওয়াল ঘেঁসে বড় বড় তিনটে জানলা। একটা টেবিল, গোটা দুই চেয়ারও রয়েছে। ওয়ার্ড-রোবটার পাশেই ড্রেসিং টেবিল। অন্যধারে সাইড-বোর্ডের ওপর রেডিও।

এরকম সুসজ্জিত ঘরে জীবনে কোনদিন একঘণ্টা সময়ও সে

থাকেনি। অথচ এখন ওরই থাকবার জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে এই ঘর।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন আবার, তুমি যে আমাদের কত আদরের তা আমি বলে বোঝাতে পারব না চম্পা।

—কিন্তু কাকাবাবু—চম্পা বলল, এতদিনের মধ্যে তো আপনারা আমার কোন খোঁজখবরই করেন নি?

—করিনি। তোমার ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না মা। বাবা আমাদের নিরস্ত করে রেখেছিলেন এবিষয়ে।

—কেন? আমার অপরাধ?

ইন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বললেন, অপরাধ কারুর নয়। এ একটা জেদের কথা। বাবার সঙ্গে দাদার কোন একটা বিষয় নিয়ে মতান্তর হয়। দাদা তখন অবিবাহিত ছিলেন।

—তারপর?

—আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবাড়ীতে সকলেরই একটু বেশী মাত্রায় সজাগ। দাদা মতান্তরের জের টেনে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরলেন না। বাবা শেষের দিকে বহু চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কিন্তু দাদা ফিরে আসেন নি। কলকাতায় তিনি বিয়ে করেছিলেন, তারপর তোমার জন্ম হল। বাবা সমস্ত খবরই রাখতেন।

ইন্দ্রনারায়ণ থামলেন। চম্পা কোন কথাই বলতে পারল না।

—দাদা অভিমান করে চলে গেছেন চম্পা। কিন্তু তুমি রয়েছ। বাবা নিশ্চয়ই……কি জানি, কাল উইল পড়ার পরই জানা যাবে কেন তিনি তাঁর মৃত্যুর পর তোমায় এখানে ডাকিয়েছেন।

চম্পা কাকার কথা শুনছিল। ও স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করেনি, এই রকম বিরাট পরিবারে ওর জন্ম হয়েছে। তাই কী মা মাঝে মাঝে বলতেন, তোর কী এত কষ্ট পাবার কথা! সবই তোর ভাগ্য।

চম্পার চোখে জল এসে গেল।

ইন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, রাতভোর ট্রেনের ধকল গেছে।

তুমি মা এখন বিশ্রাম কর।

কথা কটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

চম্পা নানা কথা ভাবতে ভাবতে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল ও, নীচে বাগান দেখা যাচ্ছে।

—ভেতরে আসতে পারি ?

ফিরে দাঁড়াল চম্পা।

—আমার নাম মিত্রানী।

মিত্রানী অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরের মধ্যে এল।

—আমি চম্পা।

—জানি। সময় বুঝেই এখানে উপস্থিত হয়েছ !

—আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—চেহারা দেখে তো তোমায় অবুঝ বলে মনে হচ্ছে না। কতদূর পড়াশুনা করেছ ? না, ওপথ মোটেই মাড়াও নি ?

বিরক্তি চেপে চম্পা উত্তর দিল, আমার জীবনটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে কাটেনি। বেঁচে থাকার জন্যে আমায় কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। তবু ওরই মধ্যে ম্যাট্রিক পাসটা করে নিয়েছি।

—কথায় তো বেশ ওজন আছে দেখছি। তবে……

—ক্ষমা করবেন, এখন আমি ক্লান্ত। বিশ্রাম করতে চাই। পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চম্পার দিকে তাকিয়ে রইল মিত্রানী, তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চম্পাও কম অবাক হল না। ও শুনেছিল মিত্রানী ওর খুড়তুতো বোন। ইন্দ্রনারায়ণের মেয়ে। কিন্তু তার একী ব্যবহার !

॥ তিন ॥

নৈশ আহার শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এল চম্পা।

রাত খুব বেশী হয়নি। বোধ হয় সাড়ে নটা।

সারাদিনের মধ্যে একে একে বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে ওর। দাদু রামনারায়ণকে ওর বেশ ভাল লেগেছে। হাসি-খুশি মানুষটি। দাদু হিসেবে যতটা বুড়ো তাঁর হওয়া উচিত, ততটা বুড়ো তিনি হননি। কাকা ইন্দ্রনারায়ণের চেয়ে বড়জোর বছর পাঁচেকের বড় হবেন। তবে তাঁর শালা জয়ন্ত চৌধুরীকে চম্পার ভাল লাগেনি। তাঁর চোখের দৃষ্টিটাই যে শুধু কেমন তাই নয়. কথাবার্তা বলার ধরনটাও অদ্ভুত!

তবে সেদিক থেকে সুপর্ণ চমৎকার লোক। বচনভঙ্গী থেকে আরম্ভ করে চলার ভঙ্গীটুকু পর্যন্ত প্রকৃত ভদ্রলোকের মত। মিত্রানীর স্বভাব অদ্ভুত লেগেছে চম্পার। কাকা ইন্দ্রনারায়ণ ও কাকিমা চারুলতা দেবীর মেয়ে বলে মনেই হয় না তাকে। আরেকজন আছেন এবাড়ীতে। তিনি হলেন রঞ্জন মুখার্জী। রাজনারায়ণের এক বন্ধুপুত্র। বন্ধু মারা যাওয়ার পর, যাকে তিনি তিন বছর থেকে মানুষ করেছেন। সে প্রায় বত্রিশ বছর আগেকার কথা। মনে হল ভদ্রলোক যেন একটু লাজুক প্রকৃতির।

অবশ্য এস্টেটের ম্যানেজার শ্রীনাথবাবু আছেন। আজ বছর পঁচিশেকের ওপর তিনি এখানে কাজ করছেন। ঘিয়ে ভাজা চেহারা। চোখমুখে একটা সচকিত-ভাব। কথাবার্তায় সব সময় বিনয় ঝরে পড়ছে। বড় বড় জমিদারী চালাতে বুঝি বা এই রকম লোকেরই প্রয়োজন হয়।

চম্পা একটা হাই তুলল।

কলকাতায় একটা চিঠি লিখলে ভাল হয়, কিন্তু আজ আর নয়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। দরজাটা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে এবার শুয়ে পড়লেই হয়। চম্পা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

এই সময় ম্যানেজার শ্রীনাথবাবুকে আসতে দেখা গেল। তাঁর পিছনে য়্যাটর্নি মহীতোষ মিত্রও রয়েছেন। চম্পা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

মিঃ মিত্র এগিয়ে এসে বললেন, এইমাত্র এসে পৌঁছলাম।

আমার মক্কেল মৃত রাজনারায়ণবাবুর নির্দেশক্রমে আজ রাত্রেই একটা মুখবন্ধ খাম আপনাকে দেবার কথা আছে আমার।

—খাম ?

—হ্যাঁ, এই নিন।

তিনি একটা পুরু খাম ওর দিকে এগিয়ে দিলেন।

চম্পা খামটা হাতে নিয়ে বলল, এতে কি আছে ?

—আমিও জানি না। চশমাটা চোখ থেকে খুলতে খুলতে মিঃ মিত্র বললেন, তবে উইল পড়ার আগে অর্থাৎ কাল সকালে খামের মধ্যেকার সমস্ত কিছু আপনাকে দেখে নিতে হবে।

এরপর তাঁরা দুজন বিদায় নিলেন।

খামটা হাতে করে ঘরের মাঝখানে এল চম্পা। বড় সাইজের বাদামী রংএর পুরু খাম। খামের ওপর টানা অক্ষরে ওরই নাম লেখা। কি আছে এতে ?

খুলি খুলি করেও কিন্তু খামটা খুলল না চম্পা। য়্যাটর্নি বলে গেলেন সকালে পড়তে। কাজেই কাল সকালে খুলে দেখলেই হবে। ও দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

খামটা রেখে দিল বালিশের তলায়।

বিছানায় শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল চম্পা। যদিও দুপুরে ও ঘুমিয়ে ছিল, তবু নিজের ক্লান্ত ভাবটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না চম্পা—হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল। ঘরের বড় আলোটা নেভান ছিল, জ্বলছিল একটা বেডরুম ল্যাম্প। তার হাল্কা আলোয় কিছু ঠাহর করতে পারল না ও। এতজোরে কিসের শব্দ হল ! মনে হল যেন কাচ ভাঙ্গার শব্দ।

চম্পা বিছানা থেকে নেমে বড় আলোটা গিয়ে জ্বালালো। আলোর বন্যায় ভেসে গেল ঘরখানা। ও সবিস্ময়ে দেখল, মেঝের ওপর কাচের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে ছত্রাকারে। এত কাচ এল

কোথা থেকে ?

বৃষ্টি হওয়ার দরুন জানলার কাচের শার্শিগুলো বন্ধ করে রেখেছিল চম্পা। শার্শির কাচ ভেঙ্গেছে না কী! ও জানলাগুলোর দিকে তাকাল। মাঝের জানলাটার পাল্লার কিছু কাচ আধ-ভাঙ্গা অবস্থায় আটকে রয়েছে।

এরকম হল কি করে? ও ভেবে কূল পেলো না।

কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল চম্পার। ও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। টানা বিরাট বারান্দাটা শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে।

থমথমে নিস্তব্ধ রাত্রি।

চম্পা দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে তাকাল, পৌনে একটা। ও এগিয়ে চলল। কোন ঘরে কে থাকে ওর জানা নেই। এই সময় কাকা বা কাকীমাকে কাছে পেলে ও হাতে চাঁদ পায়।

একটা ঘরের সামনে এসে থামল চম্পা। দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প একটু আলো বারান্দায় এসে পড়েছে। ও আর কাল বিলম্ব না করে দরজায় করাঘাত করল। ঘরে যেই থাক, অন্তত তাকে এই ঘটনার কথা বলতে পারবে ও। ভয় ভাবটা এতে কেটে যাবে খানিকটা।

দরজা খুলে গেল। স্লিপিং পাজামা আর হাত কাটা গেঞ্জি পরা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুপর্ণ। সামনে চম্পাকে দেখে একটু লজ্জিত হল। নিজের গেঞ্জি পরা অবস্থার জন্যেই অবশ্য।

অসংলগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুপর্ণ, কী, কি হয়েছে ?

অজান্তেই এক স্নিগ্ধতা নেমে এসেছিল চম্পার মনে। কাঁচা সোনার রং-এর সুপর্ণের দেহটা গেঞ্জি ফেটে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

চম্পা ওর কণ্ঠস্বরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমার ঘরের বাগানের দিকের জানলার কাচ হঠাৎ ভেঙ্গে যাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হয়—

—বলেন কী, জানলার কাচ ভেঙ্গে গেছে !

—তাইতো দেখছি। কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো গুলো।

—কী আশ্চর্য !

—দেখুন—চম্পা বলল, আমার বেশ ভয় ভয় করছে।

সুপর্ণ চিন্তিত কণ্ঠে বলল, স্বাভাবিক। চলুন তো, দেখি—।

ওরা দুজন চম্পার ঘরে এল।

জানলাটা পরীক্ষা করে সুপর্ণ বলল, কেউ কিছু ছুঁড়ে মেরে কাঁচটা ভেঙ্গেছে। অবাক কাণ্ড !

—কোন গুরুতর ব্যাপারের আশঙ্কা করেছেন নাকি ?

—আশঙ্কা—না, না। গুরুতর আর কী। তবে—

—তবে—চম্পা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

—এই ঘটনার কথা কালকে কারুর কাছে প্রকাশ না করলেই ভাল করবেন।

—বেশ।

সুপর্ণ কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে, এগিয়ে গেল সুইচ বোর্ডের দিকে।

—রাত্রে আপনার একলা থাকাটা ঠিক নয়। আমি একটা ঝিকে ডেকে দিচ্ছি। সে আপনার কাছে শোবে।

সুইচ-বোর্ডের একটা বোতামে চাপ দিয়ে আবার সুপর্ণ বলল, প্রয়োজন হলে এই বোতামটা টিপে আপনি মেড-সারভেন্টকে ডাকতে পারেন।

মিনিট ছয়েকের মধ্যেই এ দেশীয়া একটি যুবতী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। রং তার কালো হলেও মুখ চোখ বেশ ভালই বলা চলে।

সুপর্ণ তাকে দেখেই বলল, রাধা, তুমি আজ রাত্রে এই ঘরে শোবে।

রাধা নীরবে ঘাড় নাড়ল।

—আমি চলি মিস চ্যাটার্জ্জী। ঝি রইল।

সুপর্ণ ঘরের বাইরে এল।

চম্পাও দরজার দিকে এল এগিয়ে।

জয়ন্ত চৌধুরী এই সময় সেখানে উদয় হলেন। দুজনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, একী সুপর্ণবাবু! আপনি এতরাত্রে এখানে? প্রশ্নটা করার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো চম্পা। থতমত খেলো সুপর্ণ। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন ছিল মিঃ চৌধুরী। কিন্তু আপনি এই অসময়ে এখানে! কি ব্যাপার বলুন তো?

—ইমিডিয়েট নীচের ঘরটাতে আমি আছি। বার বার ওপরতলাতে ধুপধাপ শব্দ পাওয়াতে দেখতে এসেছিলাম কী ব্যাপার।

সুপর্ণ আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

চম্পা ফিরে এল ঘরের মধ্যে।

জয়ন্ত চৌধুরী বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

চম্পার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল রাধা। বলল, দিদিজী, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি একছুটে নিজের বিছানাটা নিয়ে আসি।

—বেশ তো, যাও।

এ বাড়ীতে ঝি চাকররা পরিষ্কার বাংলা বলে। রাধা বিছানা আনতে চলে যাওয়ার পর চম্পা বিছানায় এসে বসল। মনের আনাচে কানাচে নানাকথা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

একী!—বালিশের ওপর একটা নীল রংএর ভাঁজ করা কাগজ রাখা রয়েছে কেন? ও কাগজটা তুলে নিল। গোটা গোট অক্ষরে কয়েক লাইন লেখা তাতে।

চম্পা রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে ফেলল লাইন কটা—

যতদূর দেখা যায়
থৈ থৈ জল শুধু।
ঘোলা জল, নোনা জল
ছলছল, বেনোজল।

এই মাথামুণ্ডহীন কবিতা পড়ে ও অবাক হয়ে গেল।

এ আবার কী কাণ্ড! কিন্তু কাগজটা ওর বিছানার ওপর এল কী ভাবে! আর এ কাগজটা রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী!

চম্পা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখনই কী কেউ কাগজটা রেখে গেছে!

তা কী করে সম্ভব! সুপর্ণর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ওর মিনিট তিনেকের বেশী কথা হয়নি!

তবে?

তবে কী সুপর্ণই কবিতা লেখা কাগজটা কোন এক সময় ওর বিছানার ওপর রেখে গেছে! না না, তা কখনই সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সে কথা নিজেও জানে না চম্পা। তবে ও নিশ্চিত সুপর্ণর দ্বারা একাজ হয়নি।

আরেকবার ও কবিতা পড়ল—দুর্বোধ্য, হেঁয়ালী!

এই সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

রাধা বিছানা নিয়ে ঘরে এল। চম্পার মুখের ভাব দেখে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে দিদিজী? ভয় পেয়েছেন?

—কিছু না।

চম্পা ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙ্গেছে চম্পার।

রাধা ওকে এই মাত্র চা এনে দিল, চা খেয়ে ও নেমে এল নীচে। ড্রইং রুমে কাউকে দেখা গেল না। এখনও বোধ হয়

ঘুম থেকে কেউ ওঠেন নি।

চম্পা লঘুপদে বাগানে চলে এল।

বিরাট বাগানটা। একধারে ফুলের, অন্যধারে ফলের বাগান।

কালকে রাত্রের ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে চম্পা ফলের বাগানের মধ্যে এসে পড়েছিল। সারি সারি আমগাছ। কত রকমের আম। যার বেশীর ভাগ নামই কোনদিন শোনেনি ও।

— সুপ্রভাত।

চমকে মুখ ফেরাল চম্পা। করজোড়ে রঞ্জন মুখার্জ্জী দাঁড়িয়ে।

ওকে মুখ ফেরাতে দেখে, মৃদু হেসে রঞ্জন বললেন, লাজুক হিসেবে আমার একটা সুনাম বা দুর্নাম আছে, তবে আমি ঠিক লাজুক নই। লাজুক সেজে থাকি মাত্র।

একথার চম্পা কী উত্তর দেবে! তাই চুপ করে রইল।

—মরনিং-ওয়ক করা বুঝি আপনার হ্যাবিট?

—না। কলকাতায় মরনিং-ওয়াক করার তেমন সুযোগ-সুবিধা আমার ছিল না।

—তা-সত্যি। আপনাকে উদয় অস্ত যা পরিশ্রম করতে হত—

সবিস্ময়ে চম্পা বলল, আপনি কি করে জানলেন একথা?

—বাঃ, আমি জানব না!

—আমি আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না মিঃ মুখার্জ্জী।

—আপনি আমাকে না চিনলেও, আমি আপনাকে অনেক দিন থেকেই চিনি।

—আমাকে আপনি অনেক দিন থেকে চেনেন!

হাসলেন রঞ্জন মুখার্জ্জী। বললেন, তা চিনি বৈকী। বেশ, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিছুদিন আগে আপনি লাউডান কোর্টের অলোক রায় চৌধুরীর মেয়েকে পড়াতেন?

বিস্মিত কণ্ঠে চম্পা বলল, পড়াতাম।

—ওখানকার টিউশানিটা আমার জন্যেই আপনার হয়েছিল।

—আপনার জন্যে?

—অলোকবাবু আমার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে টিউশানিটা দেবার জন্যে।

—কেন? কেন আপনি আমার অজান্তেই এইভাবে আমার উপকার করেছিলেন?

হাল্কা গলায় রঞ্জন মুখার্জ্জী বললেন, 'কেন'র উত্তরটা যথা সময়েই পাবেন। চম্পা রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠল। একি গোলক-ধাধাঁ। লোকটির কথায় যে রকম আত্মপ্রত্যয় ভাব ফুটে উঠেছে, তাতে মনে হয় ও সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু—নিজেকে কেমন একটু অসহায় বোধ করতে লাগল চম্পা।

এই সময় দেখা গেল সুপর্ণ ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

এক অপূর্ব আবেশে সারা মনটা ভরে উঠল ওর। ও যেন কূল পেলো।

রঞ্জন মুখার্জ্জী একটা সিগারেট ধরালেন। সুপর্ণ কাছে আসতেই ওর দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, চলবে নাকি?

—আমি সিগারেট খাই না, আপনি তা জানেন মিঃ মুখার্জ্জী।

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিলেন রঞ্জন। উগ্রগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

চম্পা মুখে আঁচল চাপা দিল।

—ক্ষমা করবেন—আপনার অসুবিধা ঘটালাম। সিগারেটের মিক্সচারটা একটু স্ট্রং। আচ্ছা, চলি মিস্ চ্যাটার্জ্জী। এক সঙ্গে যখন রইলাম, দেখা তখন হবেই।

বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন তিনি।

চম্পা বলল, ভদ্রলোককে আমার অদ্ভুত লাগল।

—আমি বছর চারেক ধরে ভদ্রলোককে দেখছি, কিন্তু এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপর কাল রাত্রে আর কোন গোলমাল হয়নি তো?

বিরাট একটা আম গাছের গুঁড়িকে কেন্দ্র করে সিমেন্টের প্ল্যাটফর্ম করা ছিল। চম্পা তার একধারে বসে বলল, গোলমাল

অবশ্য কিছু হয়নি—তবে কে আমার বিছানার ওপর মাথা-মুণ্ডহীন কবিতা লেখা একটা কাগজ রেখে গেছে।

—কবিতা লেখা কাগজ!

চম্পা এবার একে একে সমস্ত কিছু বলল।

সুপর্ণ সমস্ত শুনে বলল, পত্রলেখকের বেশ কবিত্ব আছে বলতে হবে।

—আমাকে এ ধরনের কবিতা কে উপহার দিল মিঃ ব্যানার্জী?

সুপর্ণ চিন্তিত কণ্ঠে বলল, আমার মনে হয়, অবশ্য অনুমান মাত্র—

—কি, বলুন?

—কেউ হয়তো আপনার এখানে উপস্থিতিটা পছন্দ করছে না।

—আমি তো কারুর ক্ষতি করছি না।

—হয়তো এখানে আপনার উপস্থিতিতে অনেকের বাড়াভাতের ওপর ছাই পড়ছে।

—আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

সুপর্ণ দূরত্ব বজায় রেখে বসল।

—ভালো কথা, আপনার কোন জিনিস হারায়নি তো?

—কই, তা তো জানি না।

—আপনি বরং ঘরে গিয়ে দেখে আসুন। আমার মনে হচ্ছে আপনার বোধহয় কিছু হারিয়েছে।

চম্পা দ্রুত নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

সবই ঠিক আছে।

ঘরে গিয়ে দেখল চম্পা। কিছুই হারায়নি।

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ ওর মনে পড়ল—তাইতো, টেবিলের ওপর কাল ও নিজের পরিচয়পত্রটা রেখেছিল—যেখানা মহীতোষ মিত্র কলকাতায় ওকে দিয়েছিলেন।

কই, সেখানা টেবিলের ওপর নেই তো!

কোথায় গেল! পরিচয়পত্র দরকার হয়নি বলেই, চম্পা ওখানা

ইন্দ্রনারায়ণের হাতে দেয়নি। টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিল।

কে নিয়ে গেল ওখানা? যে ওকে অদ্ভুত কবিতাটা প্রেজেণ্ট করেছে, সেই কি? কি লাভ হবে তার এতে?

ভাবতে ভাবতে চম্পা আবার বাগানে ফিরে এল।

কিন্তু সুপর্ণের কাছে যাওয়া গেল না আর। মিত্রানী হাত পা নেড়ে তাকে তখন কি সব বলছে। মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল চম্পার।

কেন, সুপর্ণের সঙ্গে মিত্রানী কথা বলছে বলেই কি। দুদিন আগে সুপর্ণকে ও চিনত না, অথচ—কেন এমন হয়!

নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার পথে সিঁড়ির মুখে মহীতোষ মিত্রর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল চম্পার।

উনি বললেন, কাল রাত্রে আপনাকে যে এনভালপটা দিয়ে এসেছি, নিশ্চয়ই তা আপনি খুলে দেখেছেন?

ভুলেই গিয়েছিল চম্পা। তাই তো—সে খামখানা এখনো বালিশের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে।

ও তাড়াতাড়ি বলল, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। এখন গিয়েই দেখে নিচ্ছি।

—আজ সন্ধ্যা ছটার পর উইল পড়া হবে। আপনি ড্রইং রুমে উপস্থিত থাকবেন।

চম্পা ঘাড় নেড়ে ওপরে উঠে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বালিশের তলা থেকে খামটা টেনে বার করল। বেশ একটু উত্তেজনাও বোধ করেছে ও।

খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে এল দুটো পাতলা পিন-আপ করা কাগজ। একখানা চিঠি। ওকেই লেখা চিঠি।

চম্পা পড়তে আরম্ভ করল চিঠিখানা।

প্রিয় চম্পা,

এই চিঠিখানা যখন তুমি পাবে, তখন আমি পৃথিবীতে থাকব না। কাজেই লজ্জা সঙ্কোচের

আমি ঊর্ধ্বে। তোমার বাবা দেবনারায়ণের প্রতি আমি অবিচার করেছিলাম কিনা, সে বিচারের প্রশ্ন এখন ওঠে না। তবে আমি একজন সংস্কার-বদ্ধ প্রাচীনপন্থী বাপ হওয়ায় ছেলের উগ্র আধুনিকতাকে সমর্থন করিতে পারিনি। তোমার মাকে বিয়ে করার প্রশ্নে তাই আমি মত দিতে পারিনি। দেবনারায়ণ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। মতান্তর যে এভাবে ব্যবধানের সৃষ্টি করবে তা আমি ভাবিনি। আমার মনে হয়েছে আমি কি ভুল করলাম! অভাব অনটনের মধ্যে দেবনারায়ণ নিজের সংসার চালিয়েছে। ওরই মধ্যে তোমার জন্ম হয়েছে। আমি তার ধৈর্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারিনি। হঠাৎ খবর পেলাম তোমার বাবা মারা গেছেন। এ ঘটনা যে আমার বুকে কতবড় ক্ষতের সৃষ্টি করল তা নিশ্চয়ই তোমায় বলে বোঝাতে হবে না। তবে আমি তোমায় চোখে চোখে রেখে-ছিলাম। তোমার মা মারা যাবার পর তোমার অজান্তেই আমি তোমার কাজের ব্যবস্থা বার বার করে দিয়েছি। কাছে তোমাকে আনিনি—তোমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে কেন জানি না সঙ্কোচ হয়েছে। আমি স্বীকার করছি—তুনিয়ার লোকের সামনে বুক ফুলিয়ে যা বলবার সাহস আমার নেই, চুপি চুপি তাই আমি স্বীকার করছি। ভুল আমি করেছিলাম। তুটো জীবনকে আমি নষ্ট করেছি। হত্যা করেছি আমি তাদের।

সেই পাপের আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—তুমি আমায় একটা সুযোগ দেবে। আমার উইলের উল্লেখ তুমি

হাসি মুখে মেনে নেবে—এই আমার শেষ প্রার্থনা।

আরেকটা কথা। আমার একান্ত ইচ্ছে সুপর্ণকে তুমি বিয়ে করবে। ছেলেটিকে আমি দীর্ঘ দিন ধরে জানি। সৎ এবং উদার। সে তোমার উপযুক্ত স্বামী হবে, এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আশীর্বাদক
শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
১৮।৬।৫৯।
মুঙ্গের।

চিঠিখানা আবার পড়ল চম্পা।

লিখেছেন দাদু। ওরই দাদু।

চিঠির প্রতিটি ছত্রে তাঁর কত অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে। চম্পার চোখ ছলছলিয়ে উঠল—দাদু নিজের ভুলটা, বাবার প্রতি অবিচারের কথাটা মর্মে মর্মে অনুভব করে গেছেন।

চম্পা রাখবে, দাদুর কথা রাখবে। তাঁর পরলোকগত আত্মাকে ও কষ্ট দেবে না। কিন্তু···চিঠির শেষ কটা ছত্র?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও। অবশ্য অস্বীকার করে লাভ নেই। সুপর্ণ যেন ওর চিন্তার খোরাক হয়ে উঠেছে। যৌবনে পা দেবার পর থেকে নানা বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে ওর জীবন এগিয়ে এসেছে। নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার অবকাশ হয়েছে। কিন্তু সুপর্ণর মত একজনও ওর চোখে পড়েনি আজ অবধি।

মনটা অদ্ভুত হালকা হয়ে এল চম্পার। প্রথম বার—এই প্রথম বার অভূতপূর্ব আনন্দে ওর সারা মন রসাপ্লুত হয়ে উঠল।

চম্পা চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে বালিশের তলায় রেখে দিল।

এখন আর কিছু করবার নেই। তাইতো, আনন্দবাবুকে এখনও

চিঠিই লেখা হয়নি। অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়ে গেছে। সুটকেশ থেকে প্যাডটা বার করে আনন্দবাবুকে চিঠি লিখতে বসল।

সমস্তই পরিষ্কার করে লিখল চম্পা। এ বাড়ীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা থেকে, এ বাড়ীর লোকেরা ওর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করছে—সমস্ত কিছু। চিঠিটা একটু বড় হয়ে গেল। তা হোক।

প্যাডের মধ্যেই কয়েকটা খাম রাখা ছিল। তার থেকে একটা নিয়ে ঠিকানা লিখে, চিঠিটা খামের মধ্যে ভরে মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর উঠে গিয়ে চম্পা, সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই রাধা ঘরে এল।

—আমায় ডাকছেন দিদিজী ?

—তুমি চিঠি ডাকে দিতে পার ?

রাধা ঘাড় নাড়ল।

—এ চিঠিটা তাহলে ডাক বাক্সে ফেলে এস।

রাধা চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চম্পা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমবাগানটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বাঁধান প্ল্যাটফর্মের উপর বসে আছে মিত্রানী। কি সব বলছে। সুপর্ণ সামনে দাঁড়িয়ে।

চম্পার মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

সুপর্ণ এ বাড়ীতে অনেক দিন আছে। মিত্রানীর সঙ্গে তার পরিচয়ও নিশ্চয়ই দীর্ঘ দিনের। হয়তো···না, ওকথা ভাববে না চম্পা।

ও সরে এল জানলার কাছ থেকে।

॥ পাঁচ ॥

কাঁটায় কাঁটায় ছটা।

সন্ধ্যা ছটা।

ড্রইং রুমে একত্রিত হয়েছেন সকলে।

রামনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ, রঞ্জন মুখার্জ্জী, মিত্রানী, জয়ন্ত চৌধুরী,

শ্রীনাথ পাল, সুপর্ণ ও চম্পা। সকলে ছড়িয়ে বসেছেন। শুধু শ্রীনাথবাবু দাঁড়িয়ে। কর্তাদের সামনে বসতে তাঁর বাধো বাধো ঠেকছে।

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, শ্রীনাথবাবু দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

—আজ্ঞে···

—সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। বসুন।

শ্রীনাথ পাল বসলেন।

মহীতোষ মিত্র ঘরে প্রবেশ করিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সকলকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, আপনারা সকলে উপস্থিত রয়েছেন। এইবার আমি আমার মৃত মক্কেল শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উইল পড়ব।

ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছে।

মিঃ মিত্র নিজের ফোলিও ব্যাগটার মধ্যে থেকে একটা শীলকরা খাম বার করলেন। তারপর খামের মুখ কেটে উইলটা বার করতে তাঁর বিলম্ব হল না। সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন—

আমি শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৺শ্রীরায়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র! সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং স্বইচ্ছায় নিজের সোপার্জিত সম্পত্তি উইল করিতেছি। মুঙ্গের জেলার আমার বিস্তৃত জমিদারী, মুঙ্গের শহরের আমার ছয়খানি বাড়ী, ব্যাঙ্কের নগদ দশ লক্ষ টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা এই উইলের আওতায় পড়িবে।

আমার সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেকের মধ্যে, আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এক লক্ষ টাকা, বেকাপুরের বাড়ীখানা ও বিন্দাদেরার দেড়শো বিঘা জমি পাইবে। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কেল্লার বাড়ীখানা, ২৬ হাজার টাকার গহনা ও মির্জাচৌকির একশো বিঘা জমি পাইবে। আমার পৌত্রী, ইন্দ্রনারায়ণের কন্যা শ্রীমতী মিত্রানী চট্টোপাধ্যায়কে

দশ হাজার টাকার গহনা দেওয়া হইল। আমার বন্ধুপুত্র শ্রীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে টিকাপুরের পঞ্চাশ বিঘা জমি ও বড়বাজারের বাড়ীখানা দেওয়া হইল। আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারী শ্রীসুপর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ও তোপখানা বাজারের বাড়ীখানা পাইবে। ম্যানেজার শ্রীশ্রীনাথ পাল বিশ হাজার টাকা পাইবেন। তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা বিহারের দুস্থ ছাত্র সমিতিকে দেওয়া হইল।

বাকী অর্ধেক সম্পত্তি, পাঁচ লক্ষ টাকা, তিনশো বিঘে জমি, পঁচিশ হাজার টাকার গহনা ও কলেজ রোডের বাড়ীখানা আমার মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী চম্পা চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হইল।

যদি কোন কারণে এই সম্পত্তি চম্পা চট্টোপাধ্যায় লইতে অস্বীকার করে, বা সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে অথবা কোন আইন ভঙ্গ করে—তাহা হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি কলিকাতার রায়নারায়ণ ট্রাস্টের হস্তে যাইবে। এই নিয়মটি অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

আইন ঘটিত সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি মেসার্স মিত্র য়্যাণ্ড রে য়্যাটর্নি অফিসের দ্বারাই হইবে। ইহাই আমার নির্দেশ।

ভবদীয়
শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
রাজনারায়ণ লজ

৬।১।৫৯ মুঙ্গের

উইল পড়া শেষ করলেন মহীতোষ মিত্র। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু অনেকেই মুখেই অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে চম্পা। দাদু যে ওকে এইভাবে বিরাট ধনী করে যাবেন, এ ওর স্বপ্নের অতীত ছিল। বার বার

এখন মাকে মনে পড়ছে চম্পার। গোটা কতক টাকার জন্যে কত কঠিন পরিশ্রম তিনি করতেন। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল।

ইন্দ্রনারায়ণই প্রথমে কথা বললেন, আমাদের বসত বাড়ী, এই রাজনারায়ণ লজ সম্বন্ধে তো উইলে কিছু উল্লেখ নেই ?

—এই উইলে অবশ্য উল্লেখ নেই। মিঃ মিত্র বললেন, তবে মারা যাবার মাসখানেক আগে আমাকে এই বাড়ী সম্বন্ধে এক নির্দেশ পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি সেখানা রেজেস্ট্রী করতে পাঠিয়েছি। এখনও সেখানা হাতে না পাওয়ায় সঙ্গে আনা সম্ভব হয়নি।

—কি নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন ?

—এখন যারা এ বাড়ীতে আছেন ভবিষ্যতেও থাকতে পারবেন। বাড়ীখানা বিক্রী করা চলবে না এবং সংস্কারের ব্যবস্থা সকলকে মিলে করতে হবে।

রামনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। একে একে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চম্পাও নিজের ঘরে ফিরে গেল।

ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত পায়চারি করছেন রামনারায়ণ। তাঁর মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

জয়ন্ত চৌধুরী নির্বাক ভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে।

—তুমি ভাবতে পার জয়ন্ত—এক সময় বললেন রামনারায়ণ, আমার কী শোচনীয় অবস্থা হল! দাদার ওপর ভরসা করেই আমি ছিলাম।

—কী আর করবেন! এখন যে বাড়ীখানা পেয়েছেন, সেখানা বিক্রী করে কিছু······

--কিছু লাভ হবে না। এ তোমাদের কলকাতা নয়। বাড়ী-

খানার দাম এখানে খুব জোর হাজার কুড়িক। এই অল্প টাকায় আমার কি হবে ভাই ?

—জমিটা রয়েছে, তা থেকেও কিছু পেতে পারেন। তা ছাড়া পনেরো হাজার টাকার গয়না, ওটাও আপনাকে হেল্‌প করবে।

—সবই যদি আমি দিয়ে দেব তাহলে বাকী জীবনটা আমার কাটবে কী ভাবে !

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, আপনার দাদা আপনাকে চমৎকারভাবে ঠকিয়ে গেছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু—

রামনারায়ণ কাতর কণ্ঠে বললেন, উইলের দোহাই দিয়ে আমি তাকে এতদিন আটকে রেখেছিলাম কিন্তু আর তো পারব না। তুমি যা হয় একটা পথ আমায় দেখাও।

—পথ ! পথ একটা বেরুবেই। কিন্তু আমি ভাবছি ওই মেয়েটির কথা। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে যার এতটা কাল কাটল, সে …ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন জয়ন্ত চৌধুরী।

রামনারায়ণ সোনার সিগারেটকেশ থেকে একটা সিগারেট বার করে বললেন, দি আইডিয়া। জয়ন্ত, তুমি বিয়ে করবে ?

—বিয়ে ! আপনার নাতনীকে ?

—মন্দ কি ! তুমিও ধনবতী বৌ পাবে আর আমিও ভরাডুবির হাত থেকে বেঁচে যাব। কি বল ?

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন জয়ন্ত চৌধুরী। তারপর বললেন, আমার আপত্তি নেই। চেষ্টা করে দেখুন।

সিগারেটটায় অগ্নি সংযোগ করলেন রামনারায়ণ।

ড্রইংরুম থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে চম্পা। একটা অজানা শিহরণ ওকে ক্ষণে ক্ষণে উতলা করে তুলছে। জীবনের উনিশটা বছর অসম্ভব অনটনের মধ্যে ওর দিন কেটেছে, অথচ চম্পার আজ এত টাকা ! দাদু ওকে টাকার বাঁধনে বেঁধে গেছেন।

কিন্তু সুপর্ণ—দাদু ওকে কী কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। চম্পা কী ভাবে—কী ভাবে ও মেয়েমানুষ হয়ে সুপর্ণর কাছে মুখ ফুটে ওকথা বলবে। দাদু কী পারতেন না এ বিষয়ে কাকাকে লিখে যেতে।

সুপর্ণ এখন কী করছে কে জানে!

চম্পা দ্বিধা জড়িত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল।

সুপর্ণর ঘরে আলো জ্বলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আলোর কিছুটা বারান্দায় এসে পড়েছে। চম্পা এগিয়ে গেল। এখন কেমন সুপর্ণর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে ও।

একটা সুটকেশ ডালা খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর রাখা রয়েছে। সুপর্ণ জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখছে তার মধ্যে।

দরজার গোড়ায় মৃদু শব্দ হতেই ও মুখ ফিরিয়ে দেখল চম্পা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সুপর্ণ, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন—আসুন—

চম্পা ঘরের মধ্যে এল।

—সুটকেশ গুচোচ্ছেন? কোথাও যাবেন নাকি?

—হ্যাঁ।

—কবে ফিরবেন।

—আর ফিরব না। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

চম্পা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, চলে যাচ্ছেন! কেন? এ বাড়ীর উপর আপনারও অধিকার রয়েছে।

—তা আছে। তবে এখানে বসে থেকে কি হবে বলুন? যে টাকাগুলো পাব, কলকাতায় গিয়ে তা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলে বরং—

—জীবনে টাকাটাই সব নয় বোধ হয়?

—কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে টাকার প্রয়োজন তো আছে।

—আপনার যাওয়া হবে না।

—কোন কিন্তু নয়।—অনভ্যস্ত অস্থিরতা প্রকাশ পেল চম্পার কণ্ঠে।—আপনি যাবেন না।

বিস্মিত কণ্ঠে সুপর্ণ উত্তর দিল, এখানে থেকে আর আমার লাভ কি ?

—লাভ ! আমাকে এই ভাবে ফেলে চলে যাবেন ? এ বাড়ীর লোকেরা আমাকে হয়তো বিষ নজরে দেখতে আরম্ভ করেছে। আপনি চলে গেলে কতটা অসহায় বোধ করব তা কি ভেবে দেখেছেন ?

একী হল আজ চম্পার ! নিজের রাশ এখন ও কী নিজেই টেনে রাখতে পারছে না ! কয়েক সেকেণ্ড অবাক হয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে রইল সুপর্ণ। ও যেন কিছু অনুমান করে নেয়।

—আমাকেই বা বিশ্বাস করছেন কেন ? আমিও তো—

—ছোট বেলা বেলা থেকে অনেক ঘাটের জল খেয়ে আমায় বড় হতে হয়েছে। মানুষ দেখলে আমি চিনতে পারি। বলুন, আপনি যাবেন না ?

সুপর্ণ এবার মনস্থির করে ফেলে।

—তার আগে একটা কথার পরিষ্কার উত্তর দেবেন ?

—বলুন !

—আপনি রাজনারায়ণবাবুর কোন চিঠি পেয়েছেন ?

—পেয়েছি। আপনি জানলেন কি ভাবে ?

—আমিও পেয়েছি একখানা।

এবার অবাক হবার পালা চম্পার।

—আপনি—আপনিও পেয়েছেন ! কি লেখা আছে তাতে ?

—তাতে লেখা আছে—পরিষ্কার গলায় সুপর্ণ বলল, রাজনারায়ণ-বাবু আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি আমায় অনেক কিছু লেখার পর শেষে লিখেছেন—

—কি লিখেছেন তিনি ?

—এমন একটা কথা লিখেছেন, যা নাকি তিনি আপনাকেও লিখে জানিয়েছেন। কিন্তু সে কথা বলার সাহস আমার নেই। তাই আমি চলে যাচ্ছিলাম।

চম্পা মাথা নত করল। মৃদু কণ্ঠে বলল, পুরুষ মানুষ হয়ে আপনার এত সাহসের অভাব ?

সুপর্ণ এগিয়ে গেল ওর কাছে। নরম গলায় ডাকল, চম্পা—

—আপনাদের বোধহয় ডিস্টার্ব করলাম।

চমকে দুজনে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল। মিত্রানী দাঁড়িয়ে সেখানে।

আবার বলল মিত্রানী, বাবা পাঠালেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কাল থেকে কী হবে জানবার জন্যে।

—খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ! সুপর্ণর গলায় বিস্ময়ের সুর।

—হ্যাঁ। কাল থেকে সেপারেট ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আপনি আমাদের দিকে খাওয়া-দাওয়া করবেন কিনা বাবা জানতে চেয়েছেন।

এবার পরিষ্কার হল কথাটা সুপর্ণর কাছে। রাজনারায়ণবাবুর আমলে সমস্ত সংসারের খরচ তিনিই বহন করতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর, এই প্রায় মাস দুয়েক ধরে সুপর্ণই ওর কাছে থাকা তাঁর টাকা দিয়ে সংসার চালিয়েছে। আজ উইল পড়ার পর অবশ্য এ প্রশ্ন আর উঠে না। কাজেই—

—আমি···আমার....

চম্পার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। এখন ওর কিসের ভয় ! মিত্রানীর সেদিনের কথাগুলো আজও ওর কানে বাজছে।

ওই উদ্ধত মেয়েটির উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন চম্পা বলে উঠল, সুপর্ণবাবু আমার বিষয় সম্পত্তি ম্যানেজমেণ্টের ভার নিয়েছেন। ওঁর সব ব্যবস্থা আমার তরফেই হবে।

মিত্রানী সুপর্ণর দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল, তারপর শ্লেষের সঙ্গে বলল, আপনি কর্মী পুরুষ। আপনার নূতন চাকুরী

হওয়ায় আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

কথা-কটা বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুপর্ণ বলল, কী হল এটা!

নিজেকে ভীষণ হাল্কা মনে হচ্ছে চম্পার। ও মৃদু হাসল।

॥ ছয় ॥

সুপর্ণর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢোকার মুখেই চম্পা দেখল রামনারায়ণ একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন।

ওকে দেখেই বললেন, তোমার জন্যে কিছুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি ভাই।

চম্পা মৃদু গলায় বলল, কিছু বলবেন?

অল্প একটু হাসলেন রামনারায়ণ। —তোমাকে কিছু বলার কী শেষ আছে। তুমি হলে গিয়ে আমার রসের লোক। তবে এখন কোন ঠাট্টার কথা নয়—একটা সিরিয়াস কথা বলতে এসেছি।

—বলুন?

—এত দিন তুমি আমাদের চোখের আড়ালে ছিলে, কাজেই তোমার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। এখন তোমার ভালমন্দ সম্বন্ধে আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে।

—আপনারা ছাড়া আমার আর কে আছে?

গলাটা ঝেড়ে নিয়ে রামনারায়ণ বললেন, খাঁটি কথা। তোমার অর্থের দিকের সুচারু ব্যবস্থা দাদা করে গেছেন। কিন্তু অর্থই সব নয়। ওই সঙ্গে চাই তোমার অভিভাবক।

—অভিভাবক!

—হ্যাঁ। মানুষের মৃত্যুর কথা বলা যায় না। আমি বা ইন্দ্র কিছু চিরকালই তোমার মাথার ওপর থাকব না, তখন—

চম্পা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন দাদু?

—আমি তোমার বিয়ের কথা বলছি ভাই।

—বিয়ে! কিন্তু—

—আমার কাছে লজ্জা কি ভাই? পাত্র নির্বাচন করার দায়িত্ব না হয় আমিই নিলাম।

—কিন্তু আমি বলছিলাম—চম্পা নম্র গলায় বলল, আমার বিয়ের ব্যবস্থা তিনিই করে গেছেন।

—কে? দাদা!

—হ্যাঁ।

—কি রকম?

চম্পা রাজনারায়ণের চিঠিখানা এনে দিল।

গম্ভীর মুখে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিখানা পড়লেন রাম-নারায়ণ। তারপর চম্পাকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সিঁড়ির মুখেই তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণের দেখা হল।

ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কি হল, ছোটকাকা?

তিক্তস্বরে রামনারায়ণ বললেন, মেয়েটার কাছে পদে পদে অপমানিত হবার সমস্ত ব্যবস্থাই দাদা পাকা করে গেছেন।

—অর্থাৎ—

—তোমাকে তো কাল বল্লামই—তাছাড়া এটা আমাদের কর্তব্যও, চম্পার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা। এখন গিয়ে শুনলাম দাদা নিজেই সুপর্ণর সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক করে গেছেন।

—সুপর্ণর সঙ্গে? আকাশ থেকে পড়লেন ইন্দ্রনারায়ণ!

—তবে আর বলছি কি!

রামনারায়ণ নীচে নেমে গেলেন।

হপ্তা খানেক কেটে গেছে।

বাড়ীর সকলেই জানতে পেরেছেন চম্পা ও সুপর্ণর বিয়ের কথাটা। রাজনারায়ণ নিজেই যে এই বিয়ে ঠিক করে গেছেন একথাও কারুর অজানা নেই।

চম্পা নিজেই এখন নিজের গার্জেন। সঙ্কোচ ও পরিহার করেছে। প্রয়োজন হলে সকলের সামনেই সুপর্ণর সঙ্গে কথা বলে।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

চম্পা ও সুপর্ণর সঙ্গে কথা হচ্ছে চম্পার ঘরে।

সুপর্ণ বলল, এখানে তোমার অসুবিধাটা কিসের আমি বুঝতে পারছি না?

—অসুবিধা কিছুর নয়। কলেজ রোডের বাড়ীতে গিয়েই যদি থাকি, তাতেই বা কী এল-গেল বল না।

—কিন্তু তুমি ওখানে থাকবে কি করে? একলা থাকবে নাকি? এখন নিশ্চয়ই শুধু তুমি আর আমি এক বাড়ীতে থাকতে পারি না?

চম্পা হেসে ফেলল। —তা তো পারিই না। তুমি বাপু ভীষণ অধৈর্য লোক। যাব বলে কী, এখুনি যাব নাকি!

রাধা এল ঘরে।

বলল, দিদিজী, কলকাতা থেকে আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে।

কলকাতা থেকে!

চম্পা রাধার সঙ্গে নীচে নেমে এল।

ড্রইং-রুমে একটা কৌচে জড়সড় হয়ে বসে আছেন মামা। বেশ কয়েক বছর পরে দেখা হলেও তাঁকে চিনতে কষ্ট হল না চম্পার। তাঁকে দেখেই ওর মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। টাকার গন্ধে এসেছেন নিশ্চয়ই। স্বাভাবিক।

—এই যে মা, খবর পেয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

ভ্রূ কুঁচকে চম্পা বলল, কেন এলেন? আমি তো আপনার অপেক্ষায় ছিলাম না।

মামা কালীচরণ আকাশ থেকে পড়লেন।—সে কী কথা মা জননী! তুমি হলে আমার একমাত্র সহোদরা বোনের একমাত্র......

—থামুন। কোথায় ছিল আপনার দরদ সেদিন, যেদিন আমি অসহায় ভাবে আপনার সাহায্যপ্রার্থী ছিলাম ?

আমতা আমতা করে কালীচরণ বললেন, অভাব অনটনের মধ্যে আমার দিন চলে। আবার একটা নতুন দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে এল মনে করে, সেদিন আমি তোমায় কটু কথা বলেছিলাম মা। তবে—

এরপর তিনি বিস্তারিত ভাবে চম্পাকে শোনালেন, বিশ বছরের নানা অভাব অভিযোগের ইতিহাস।

চম্পা অধৈর্য কণ্ঠে বলল, আমায় এত কথা শুনিয়ে লাভ কী। এখন আপনি কী বলতে এসেছেন তাই বলুন।

—বলতে খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে মা। কী বলে গিয়ে—

—বলতে যখন এসেছেন তখন আর সঙ্কোচ করে লাভ কী !

—হ্যাঁ, হ্যাঁ এই বলি। বড় মেয়েটার বিয়ে যাহোক করে দিয়েছি। এখন ভাবনা তার পরেরটিকে নিয়ে। তাকে যে পার করতে পারব যে ভরসা আমার নেই। এখন···

চম্পা নির্বিকার গলায় বলল, তার বিয়ের ব্যবস্থা করুন। যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমি করব।

—সে তো জানিই। সেই ভরসায় তো তোমার কাছে আসা। সাহায্যই যদি করতে চাও তাহলে আমার কৃষ্ণাকে নিজের কাছেই রাখ না।

—কৃষ্ণা, মানে....

—আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। বাইরে বারান্দায় সে অপেক্ষা করছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় চম্পা।

—পাকাপোক্ত ব্যবস্থা সব করেই এসেছেন দেখছি। বেশ, সে আমার কাছেই থাকবে। তবে আপনার থাকা চলবে না। ভবিষ্যতে আপনি আমার কাছে আসবেন না—একথা যদি দিতে পারেন—

বিনয়ে ভেঙ্গে পড়লেন কালীচরণ। বললেন, তাই হবে মা। তুমি কৃষ্ণাকে নিজের কাছে রাখবে। তাকে পাত্রস্থ করবে—এছাড়া

আমার আর কোন অনুরোধ নেই।

রাধাকে নির্দেশ দিল চম্পা কৃষ্ণাকে ডেকে আনবার জন্মে।

কৃষ্ণা ঘরে এল। নাম কৃষ্ণা হলেও গায়ের রংএ গৌরী। চোখমুখের একটা শ্রী আছে। বয়স বছর সতেরো৷হবে।

চম্পার খারাপ লাগল৷না কৃষ্ণাকে।

ও উঠে গিয়ে তার হাত ধরে একটা কোচে তাকে বসাল।

কয়েকদিন পার হয়েছে আরো।

কৃষ্ণা চমৎকার ভাবে মানিয়ে নিয়েছে চম্পার সঙ্গে।

শুধু সুপর্ণকে দেখলে সে কেমন যেন হয়ে যায়। লজ্জায় মুখ তুলতে পারে না।

আজ একটা গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেছেন ইন্দ্রনারায়ণ।

একঘেয়ে জীবনযাত্রার ওপর কিছু বৈচিত্র আনাই হল এই পার্টির উদ্দেশ্য। খাওয়া-দাওয়ার খরচ অবশ্য সমস্তই ইন্দ্রনারায়ণের। তবে পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে চম্পার কলেজ রোডের বাড়ীতে। কারণ এই বাড়ীখানা শহরের কোলাহল থেকে বাইরে এবং বাগান ও পুকুর আছে।

ব্রেকফার্স্ট সেরেই সকলে কলেজ রোডের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহীতোষ মিত্রও আছেন মুঙ্গেরে। আইন ঘটিত সমস্ত গোলমাল মিটে না খাওয়া পর্যন্ত তাঁর নড়বার উপায় নেই।

বাড়ীটা এতদিন তালা বন্ধই ছিল। কাল ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে মাত্র। খাওয়া দাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা হচ্ছে। দুজন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চারুলতা দেবী স্বয়ং সমস্ত আয়োজনে ব্যস্ত রয়েছেন।

চম্পা একবার তাঁকে বলেছিল, কাকীমা, আমি বরং আপনার সঙ্গে রান্নাঘরেই থাকি। কাজের সাহায্য হবে।

হেসে চারুলতা বলেছিলেন, না মা। তোমাকে আর রান্না ঘরে বন্দী থাকতে হবে না। তাছাড়া উনুনের তাত দেখছ তো ?

—আপনার তাতে কষ্ট হচ্ছে না—আমারই বুঝি যত কষ্ট হবে ?

—পাগল মেয়ে। আমি হলুম বুড়ো-হাবড়া মানুষ। আমার আগুনের তাত গা সওয়া। তুমি কেন মিথ্যে কষ্ট করবে মা। যাও গল্পসল্প করগে যাও।

অগত্যা—পুকুরের ধারে গিয়ে বসল চম্পা। কৃষ্ণাকে ডেকে নিল।

সুপর্ণ আগে থেকেই ছিল ওখানে। কৃষ্ণা দূরত্ব বজায় রেখে বসেছে। চম্পার আর তার পরনে একই ধরনের শাড়ী। কাল বাজারে গিয়েছিল চম্পা। কিছু কেনা-কাটা করেছে। এই শাড়ী দুটোও কিনেছে কাল।

একথা-সেকথার পর চম্পা ও সুপর্ণের আলোচনার মোড় নিল, হঠাৎ ইন্দ্রনারায়ণ এই পার্টির আয়োজন করলেন কেন ?

একসময় কৃষ্ণা উঠে গেছে ওরা খেয়াল করেনি।

হঠাৎ সুপর্ণ রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি একটু বস। আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আসছি।

—কোথায় যাবে ?

—একজনকে গোটাকতক কথা বলে আসছি।

—আমি আর বসব না। আমি বরং কাকার সঙ্গে গিয়ে গল্প করি। ওরা দুজনেই ঘাসের ওপর থেকে উঠে পড়ল।

॥ সাত ॥

প্রথমে ব্যাপারটা ধরা পড়েনি।

ধরা পড়ল খাবার সময়।

অনেকেই লক্ষ্য করলেন, সকলেই খাওয়ার টেবিলে উপস্থিত—শুধু কৃষ্ণা সেখানে নেই।

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবশ্য কিছু ছিল না। হয়তো হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় সে খেতে আসেনি।

তবু চিন্তিত হল চম্পা। শরীর খারাপ হয়েছে অথচ কৃষ্ণা ওকে কিছু জানাল না। এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার তো ঘটতে পারে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই জটিল হয়ে উঠল।

সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কৃষ্ণাকে পাওয়া গেল না।

কোথায় গেল কৃষ্ণা ?

সে এখানকার কিছুতেই পরিচিত নয়। বাইরের কারুর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। কাজেই বাড়ীর বাইরে যে সে কোথাও যেতে পারে, এরকম সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেবার মত কোন জোরাল যুক্তিই নেই।

তবু বাড়ীর চতুর্দিকে অনুসন্ধান করা হল।

ফলাফলে কোন তারতম্য ঘটল না। সারাদিনের মধ্যে কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না কৃষ্ণার। সকলে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

রামনারায়ণ বললেন, আমার মনে হয় আর কাল বিলম্ব না করে পুলিসে খবর দেওয়াই ভাল।

—ছোটকাকার সঙ্গে আমি একমত। ইন্দ্রনারায়ণ সমর্থন জানালেন।

পুলিসে খবর দেওয়া হল।

পুলিসের পক্ষ থেকে আবার নতুন করে খোঁজাখুঁজির পালা আরম্ভ হল। কোন হদিসই পাওয়া গেল না তার সেদিন। তবে শেষ পর্যন্ত তার সন্ধান পাওয়া গেল পরের দিন বেলা দশটার পর।

কলেজ রোড সোজা কলেজ পেরিয়ে, পাঁচ নম্বর গুমটি পার হয়ে অর্থাৎ রেল লাইন টপকে নির্জন, প্রায় জঙ্গলের কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে কৃষ্ণাকে পাওয়া গেল।

মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে দেহটা।

প্রাণ নেই।

মারা গেছে অনেক আগেই। সারা শরীরে হিম কঠিনতা।

জনৈক গ্রাম্য লোক ওই পথ দিয়ে আসছিল শহরে। তারই চোখে পড়ে মৃতদেহটা প্রথমে। সেই বুদ্ধিমানের মত পুলিসে খবর দেয়।

মৃতদেহ বয়ে আনা হল থানায়। রাজনারায়ণদের সকলেই সনাক্ত করলেন কৃষ্ণাকে।

চম্পা ভয়ে ভাবনায় একেবারে মিইয়ে পড়েছে। ওর অনুরোধেই ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, আপনারা অনুমতি করলে আমরা মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করতে পারি।

—তাতো সম্ভব নয়।—ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কুলদীপ মেহরা সেখানে উপাস্থত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি দুঃখিত। আমরা অনুমান করছি এটা একটা মার্ডার। ডেড-বডি পোস্টমর্টমে পাঠাতে হবে।

—মার্ডার !! কথাটা এক সঙ্গে অনেকেই উচ্চারণ করলেন।

—বডি যে ভাবে পড়েছিল এবং চতুর্দিকের যা সিচুয়েশান তাতে আমাদের ওই কথাই মনে হচ্ছে। মিঃ মেহরাই কথাটা বললেন।

জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, ওতেই কী—

—বলতে পারছি না। পোস্টমর্টমের পরই সমস্ত বুঝতে পারা যাবে। এখন আপনারা আসুন। আমি সময় মত খবর দেব।

সকলের মনেই এক প্রশ্ন, কৃষ্ণা খুন হয়েছে।

কে এই কাজ করলে ? কিসের স্বার্থে ?

চম্পা ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে উঠল। কী উত্তর ও দেবে কালীচরণকে। চম্পাকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা সুপর্ণ খুঁজে পায় না।

বিরাট রাজনারায়ণ লজ উৎকণ্ঠায় থমথম করছে।

পরের দিন সন্ধ্যার পর কুলদীপ মেহরা এলেন।

ড্রইং-রুমে ডাকালেন সকলকে।

তারপর বললেন, আমাদের অনুমানই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কৃষ্ণা দেবী অবশ্য ঠিক কী ভাবে মারা গেছেন, এখনো বুঝতে পারা যায়নি। তবে তিনি যে খুন হয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর দেহে বিষ বা ওই ধরনের কিছু না পাওয়া গেলেও, তাঁকে যে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে ডাক্তাররা প্রায় একমত।

কারুর মুখে কথা নেই। সকলেই নির্বাক।

মেহরা আবার বললেন, আমরা এবার এই হত্যার তদন্ত আরম্ভ করব। আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা চাই।

রামনারায়ণ বললেন, আমার মনে হয় সকলেই এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। আমি শুধু ভাবছি মেয়েটা এভাবে মারা পড়ল কেন?

—তারই অনুসন্ধান করতে হবে মিঃ চ্যাটার্জ্জী। ভালকথা, এটা কি আপনাদের মধ্যে কারুর—দেখুন তো?

মিঃ মেহরা একটা কাফলিঙ্ক তুলে ধরলেন।

সোনার কাফলিঙ্ক। একদিকে ব্লু-মিনের ওপর সোনালী অক্ষরে 'এস' লেখা রয়েছে।

—এটা পাওয়া গেছে মৃতদেহের কাছেই। আমরা এটাকে বড় রকম সূত্র বলে মনে করছি।

চম্পার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। কারণ—

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, আমাদের চুপ করে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ওটি সম্বন্ধে যদি কারুর কিছু জানা থাকে, তাহলে পরিষ্কার করে বলে ফেলাই ভাল।

রঞ্জন মুখার্জ্জী এবার বললেন, আমি সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওই কাফলিঙ্কখানা আমি সুপর্ণবাবুকে ব্যবহার করতে দেখেছি। তাছাড়া 'এস' অক্ষরটিও তাঁরই নামের প্রথম অক্ষর।

—সুপর্ণবাবু! তিনি কে?

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, দাদার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল।

কুলদীপ মেহরা বললেন, কার নাম সুপর্ণবাবু? আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কিন্তু সুপর্ণকে পাওয়া গেল না ঘরে!

এমনকি সারা বাড়ী খুঁজেও পাওয়া গেল না।

মিঃ মেহরা থানায় ফেরার আগে বলে গেলেন, সুপর্ণবাবু ফিরে এলে তাঁকে যেন থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু দুদিনের মধ্যেও সুপর্ণকে রাজনারায়ণ লজে ফিরতে দেখা গেল না।

চম্পা ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠল।

তৃতীয় দিন পুলিস এসে সুপর্ণর ঘর সার্চ করল।

সন্দেহজনক কিছু পাওয়া না গেলেও, জামাকাপড়, টুথব্রাস ইত্যাদি রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ঘরে দেখা গেল না।

সমস্ত দেখে শুনে ইন্‌স্পেক্টার লালচাঁদ বললেন, পাখী উড়ে গেছে।

জয়ন্ত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, অর্থাৎ?

—আমরা সন্দেহ করেছি বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক সরে পড়েছেন। এখন তাঁকে হাতে পাওয়া বেশ কষ্টকর হবে!

না, না একথা বিশ্বাস হয় না চম্পার। সুপর্ণ একাজ করতে পারে না। কেন ও কৃষ্ণাকে···ওর স্বার্থ কি?

তবে—

সুপর্ণ গেল কোথায়? কেন গেল?

সারাটা দিন ছটফট করে কাটল চম্পার।

মিত্রানী দূর থেকে ওকে বার কতক দেখে গেছে। তার চোখে আর ঈর্ষা কাতর ভাব নেই বরং পরিবর্তে কিছুটা অনুকম্পাই ঝরে পড়ছে।

কী করবে চম্পা। কৃষ্ণা মারা যাওয়াতেই ও আধমরা হয়ে পড়েছিল, আবার সুপর্ণ—যার ওপর ও সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে—

পুলিসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে সুপর্ণকে···কিন্তু ওই ঝোপের মধ্যে মৃতদেহের কাছে ওর কাফলিঙ্কটা গেল কী ভাবে !

কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে রাজনারায়ণবাবুর অফিস ঘরে এল। টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল ও। এই ঘরে টেলিফোন আছে আগেই শুনেছিল সুপর্ণর মুখে।

চম্পা রিসিভারটা তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জকে অনুরোধ করল, টাউন থানার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিতে। কিন্তু কানেক্সান পাবার আগেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও।

ফোনে আর কতটুকু কথা হবে। কুলদীপ মেহরার সঙ্গে সরাসরি দেখা করবে চম্পা।

ও কাউকে কিছু না জানিয়ে, রাজনারায়ণ লজ থেকে বেরিয়ে এসে, একটা রিক্সায় চেপে বসল। টাউন থানায় যাবার নির্দেশ দিল চালককে। থানায় এসে একজন কনস্টেবলের কাছে জানতে চাইল মিঃ মেহরা আছেন কিনা। সৌভাগ্যক্রমে তিনি অফিসেই ছিলেন। সংবাদ পেয়ে স্বয়ং এসে ওকে নিয়ে গেলেন নিজের অফিস ঘরে। এই ধনবতী মহিলাটির পরিচয় কুলদীপ মেহরার অজানা ছিল না। তিনি মহীতোষ মিত্রের মুখ থেকে সবিস্তারে শুনেছিলেন সমস্ত কথা।

—বসুন। বসুন মিস চ্যাটার্জ্জী।

চেয়ারে বসতে বসতে চম্পা বলল, সুপর্ণবাবুর কোন সন্ধান পাওয়া গেছে ?

—না, তবে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে।

—তাঁর কাফলিঙ্কটা ওখানে পাওয়া গেছে বলেই যে তিনি হত্যাকারী, এ ধারণা আপনারা করছেন কেন ?

মৃদু গলায় মেহরা বললেন, করতাম না, যদি না তিনি পালিয়ে যেতেন।

—কিন্তু আমি আপনাদের ধারণার উপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

—আমি আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। আর এও বুঝতে পারছি আপনি আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। এক্ষেত্রে—

—এক্ষেত্রে কি বলুন ? চম্পা বলল।

—আপনি প্রয়োজন বোধ করলে প্রাইভেট এন্‌কোয়ারী করাতে পারেন।

—প্রাইভেট এন্‌কোয়ারী ?

কুলদীপ মেহরা গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, সুপর্ণবাবুর জন্যে আপনার উদ্বেগ কতখানি, তা আমার অজানা নেই। তাই বলছি— পুলিসের লোক হয়েও বলছি, আমাদের হাতে কেইসটা একটু ঢিলে-তালেই এগুবে। তার চেয়ে—

—কিন্তু আমি তো—

—সে জন্যে চিন্তা করবেন না। আমি একজন বেসরকারী গোয়েন্দার সন্ধান দিচ্ছি। উপযুক্ত লোক। নিশ্চয়ই নাম শুনে থাকবেন, বাসব ব্যানার্জ্জী ?

এ নাম শুনেছে চম্পা। খবর-কাগজের দৌলতে তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভার কথা ওর অজানা নয়। কুলদীপ মেহরার কাছ থেকে বাসবের ঠিকানাটা ও নিয়ে নিল। ঠিকানার সঙ্গে ফোন নম্বরও দিলেন তিনি।

বাড়ী ফিরেই ট্রাঙ্ক-কল বুক করল চম্পা।

*　　　　*　　　　*

ধোঁয়ার কুণ্ডলী রিং-এর আকারে উপরের দিকে উঠে চলেছে।

সন্ধ্যা নেমেছে অনেক আগেই।

বাসব একাগ্রমনে সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং রচনায় ব্যাপৃত রয়েছে। শৈবাল বসে আছে ঠিক ওরই সামনে আরেকটা কোচে। কারুর মুখে কথা নেই। শৈবাল একটা পত্রিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

এই সময় দেওয়াল ঘড়িটায় সশব্দে সাতটা বাজল।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলতে ফেলতে বলল, কি এত মন দিয়ে পড়ছ ডাক্তার ?

শৈবাল পত্রিকাটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর চমৎকার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে—দেখছিলাম পড়ে।

পড়ে কি দেখলে ?—লেখক কি বলতে চেয়েছেন উপস্থিত বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই গোলমেলে ?

—তা গোলমেলে বইকী। পৃথিবীর চারিদিকে এখন কী হয় কী হয় ভাব।

বাসব কোচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, শেষ পর্যন্ত যে কী হবে তা আমি জানি।

সাগ্রহে শৈবাল প্রশ্ন করল, কি হবে ?

বাসব হোয়াটনটের দিকে এগিয়ে গেল। হোয়াটনটের ওপরে সিগারেটের কৌটাটা রাখা ছিল। তার থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল ও। তারপর দীর্ঘ একটা সুখটান দিয়ে বলল, কিছুই হবে না। পৃথিবীর দুধারের দুই শক্তিমান দেশ বড় বড় বুলি কপচে বাজার গরম করে রাখবে। এই ভাব চলবে, তুমি দেখে নিও।

শৈবাল আর কিছু বলল না।

আবার নীরবতা নেমে এল ঘরের মধ্যে।

কথা যেন ওদের হারিয়ে গেছে।

একটানা দিনের পর দিন কত গল্প করা যেতে পারে! বেশ কিছু দিন বেকার বসে আছে বাসব। হাতে কোন কাজ নেই, কাজেই শৈবালের সঙ্গে কথার জালবোনা ছাড়া আর উপায় কী।

এক সময় আবার বাসবই নীরবতা ভঙ্গ করল, ডাক্তার ?

মৃদু হেসে শৈবাল বলল, অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না, তোমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে আর খুব দেরী নেই।

—স্বাভাবিক। কতদিন ধরে সম্পূর্ণ বেকার বসে আছি বল

তো। কিন্তু আমি ভাবছি—

—কি ভাবছ?

—ভাবছি, দেশের অসাধু লোকেরা কি সব সাধু হয়ে গেল? অবশ্য এ খুবই সুলক্ষণ। কিন্তু এই সুলক্ষণের ধাক্কায় আমাদের মত অধম জনেদের যে আর পেট চলে না।

শৈবাল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা আর হল না। টেলিফোন বেজে উঠল এই সময়। ট্রাঙ্ক-সিগ্ন্যাল—!

বাসব রিসীভারটা তুলে নিল—হ্যালো—

অপ্যারেটারের গলা পাওয়া গেল, ট্রাঙ্ক কল প্লিজ—মুঙ্গের হিয়ার—

॥ আট ॥

সকালের ট্রেনেই মুঙ্গের এসেছে বাসব।

সঙ্গে শৈবাল আছে। ওরা অবশ্য রাজনারায়ণ লজে নামেনি। নেমেছে শৈবালের শ্বশুরালয়ে।

এই বেসরকারী তদন্তের অনুমতি পুলিসের কাছে নিয়ে রেখেছে চম্পা। কাজেই ওদিক থেকে কোন অসুবিধা নেই।

বাসব রাজনারায়ণ লজের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত হল। ওর আগমনে তাঁদের মনোভাবটা ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেল। কুলদীপ মেহরা অফিসেই ছিলেন। ওদের দেখে তিনি প্রায় আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন।

মৃদু হেসে বাসব বলল, প্রায় দুবছর পরে দেখা, কি বলেন মিঃ মেহরা?

—ভাগ্যিস আপনার ঠিকানাটা আমার কাছে ছিল, তাই আপনাকে আবার টেনে আনতে পারলাম।

—আমি তো ভেবেছিলাম, আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

—তিন বছর করে এক এক জায়গায় আমাদের পোস্টিং। এখনও আছি মুঙ্গেরে এক বছর।

এরপর কাজের কথা আরম্ভ হল।

কথা প্রসঙ্গে মিঃ মেহরা বললেন, এই মার্ডারের মধ্যে একটা জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার। হত্যাকারী অন্য কোথাও হত্যা করে বডিটা বয়ে এনে ওই ঝোপের মধ্যে ফেলে এসেছিল।

—আপনি এই সিদ্ধান্ত করছেন কেন? বাসব প্রশ্ন করল।

—কারণ, যেখানে লোক চলাচল রয়েছে, এ রকম একটা জায়গায় খুন করা বেশ রিস্কি। শুধু আমি বুঝতে পারছি না, বডিটা ওখানে বয়ে নিয়ে যাবার অর্থ কি?

—পোস্টমর্টমের রিপোর্ট রেডি নাকি? আমি একবার দেখতে চাই। রিপোর্টখানা আনালেন মিঃ মেহরা।

বাসব মনোযোগ দিয়ে পড়ল। প্রথমে বাঁদিকের কাঁধের ওপর শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। কারণ কাঁধের হাড় এক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। তারপর শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু গলায় আঙ্গুল বা অন্য কোন চাপের দাগ নেই। সার্জন আরো জানিয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে সকাল সাড়ে নটা থেকে এগারোটার মধ্যে।

বাসব অন্যমনস্ক ভাবে রিপোর্টখানা নামিয়ে রাখলেন।

—কি দেখলেন?

—এখন মতামত প্রকাশ করাটা ঠিক হবে না। আচ্ছা, আমরা এখন উঠলাম মিঃ মেহরা। আবার দেখা হবে!

টাউন থানার বাইরে এসে ওরা একটা রিক্সা করে সোজা চলে এল রাজনারায়ণ লজে। সকলেই তখন যে যার ঘরে।

খবর পেয়েই চম্পা নীচে নেমে এল।

বাসব বলল, আপনাকে এ সময় বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।

—মনে আর কী করব। এই বিপদে আপনি আমায় সাহায্য

করবেন বলেই তো আপনাকে ডেকে আনলাম মিঃ ব্যানার্জ্জী।

বাসব এসেই মোটামুটি ঘটনাটা শুনেছিল।

ও পরিষ্কার গলায় বলল, বিপদটা কোন দিক থেকে? আপনার মামাতো বোন নিহত হয়েছেন বলে, না সুপর্ণবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে?

চম্পা নত মুখে বলল, দুটো ব্যাপারই আমাকে সমান ভাবিয়ে তুলেছে।

—এবার গোটাকতক প্রশ্ন আপনাকে আমি করব। তার সঠিক উত্তর দেবেন, এই আমার অনুরোধ।

—বলুন?

—দুর্ঘটনার দিন শেষ আপনি কৃষ্ণা দেবীকে কখন দেখেন?

—নটা আন্দাজ সময়। আমি সুপর্ণবাবু আর কৃষ্ণা কলেজ রোডের বাড়ীর পুকুরের পাড়ে বসেছিলাম। কৃষ্ণা এক সময় উঠে গেল! তারপর আর তাকে জীবিত অবস্থায় দেখিনি।

—কৃষ্ণা দেবী উঠে যাবার কতক্ষণ পরে আপনারা ওখান থেকে উঠেছিলেন?

—কিছুক্ষণের মধ্যেই। সুপর্ণবাবুর কী একটা কাজ ছিল। উনি উঠলেন—আমিও উঠে পড়লাম।

—আচ্ছা মিস্ চ্যাটার্জ্জী, কতক্ষণ পরে আবার আপনার সুপর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—যতদূর মনে পড়ছে ঘণ্টা দেড়েক পরে।

—সুপর্ণবাবুর পরনে কি জামাকাপড় ছিল মনে আছে?

বিস্মিত কণ্ঠে চম্পা বলল, সাদা ট্রাউজার আর ব্লু-ফ্লাইং সার্ট।

—আপনি এ বাড়ীতে প্রথম দিন পা দেওয়ার পর থেকে সুপর্ণবাবু অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত, যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, অনুগ্রহ করে আমায় বলুন?

চম্পা একে একে সমস্ত কিছু বলে গেল। কোন কথা বাদ দিল না। এখন লজ্জা করার সময় নয়।

বাসব সমস্ত শুনে বলল, আপনি কবিতা লেখা যে কাগজটা পেয়েছেন, সেটা আমায় এনে দিন।

চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাসব প্রশ্ন করল, ডাক্তার, কি বুঝলে ?

শৈবাল বলল, বিশেষ কিছু বুঝিনি। তবে হঠাৎ এতগুলো টাকা পেলে মানুষ যে রকম প্রাউডি হয়ে ওঠে ; ভদ্রমহিলার তেমন কোন কমপ্লেক্স আসেনি বলেই মনে হচ্ছে।

—আরেকটা জিনিস কথাবার্তায় ; হাবেভাবে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে ভদ্রমহিলা সুপর্ণবাবুকে দারুণ ভাবে ভালবেসে ফেলেছেন।

চম্পা চিঠিখানা হাতে করে ফিরে এল। বাসব ওর হাত থেকে সেখানা নিয়ে বলল, ধন্যবাদ মিস্ চ্যাটার্জ্জী। এখন আমরা চলি আবার আসব।

রাজনারায়ণ লজ থেকে বেরিয়ে বাসব ও শৈবাল একটা রিক্সা ডাকল। রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথা কয়ে জানা গেল, সে জানে সম্প্রতি কোথায় একজন বাঙ্গালী মহিলা খুন হয়েছেন।

না জানার কথা নয়। মুঙ্গের ছোট শহর। এই খুনের ব্যাপার নিয়ে চারিধারে প্রচুর হৈ চৈ পড়ে গেছে।

বাসব রিক্সায় উঠে বসেছে—শৈবাল উঠতে যাচ্ছে এমন সময় তার নজরে পড়ল, রাজনারায়ণ লজের দোতলার একটা জানলার ওপর। কে যেন তাদের নিরীক্ষণ করছিল, এবার জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শৈবাল তাড়াতাড়ি রিক্সায় উঠে বসে বলল, ওহে—

—দোতলার একটা জানলা দিয়ে আমাদের কেউ লক্ষ্য করছিল এই তো। তা আমি জানি ডাক্তার।

—কিন্তু আমরা কি খুব দর্শনীয় ?

—দর্শনীয় না হলেও ভীতিকর হতে পারি। আমি এও জানি, যখন আমরা ড্রইং-রুমে বসে চম্পা দেবীর সঙ্গে কথা কইছিলাম

তখনও ওই অদৃশ্য-দর্শকটি আমাদের দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন।

—বল কি ?

বাসব মৃদু হাসল শুধু।

রিক্সা তখন দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে।

মিনিট কুড়িক লাগল প্রায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে।

লোকালয় থেকে দূরে নির্জন এক পরিবেশ। এঁকে-বেঁকে পিচঢালা-পথটা চলে গেছে চোখের আড়ালে। পথের দুপাশে ঝোপের সমারোহ। দূরে কুচকুচে কালো রং-এর পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে।

রিক্সা যেখানে থেমেছিল, তার হাত দশেক দূরেই একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। ওরা এগিয়ে গেল সেদিকে।

কনস্টেবলটি বাসবের নাম শুনেই সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। বুঝতে পারা গেল কুলদীপ আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

বাসব তাকে প্রশ্ন করল, এই ঝোপের মধ্যেই কি মৃতদেহ পড়েছিল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ?

ঝোপটি বেশ বড় এবং ঘন। খুব ছোট ছোট কতগুলো শাল গাছের উপর [illegible] না-জানা লতা ছেয়ে ঝোপের সৃষ্টি করেছে। ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রায়। তবে ঝোপের ভেতরের আয়তনটা ছোট নয়। জন চারেক লোক বেশ আরামে বসতে পারে।

বাসব শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

স্যাঁৎস্যাঁতে মাটির ওপরে শুকনো ও আধশুকনো পাতা ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র। ও পকেট থেকে পেন্সিল টর্চটা বার করে বোতাম টিপল। আলোকিত হয়ে উঠল জায়গাটা।

বাসব তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে চতুর্দিক দেখতে লাগল। কিন্তু পাতার সমারোহ ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। ও ঝোপ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, ডাক্তার, তোমার ছাতাটা দাও তো ? শৈবালের হাতে ছাতা ছিল। সে তাড়াতাড়ি সেখানা বাড়িয়ে দিল।

বাসব ছাতাটা দিয়ে ঝোপের মধ্যকার পাতাগুলো সরাতে লাগল। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল—পাতা সরে গিয়ে এক জায়গায় বেশ কিছুটা জমি বেরিয়ে পড়েছিল, সেখানে হলদে হলদে কী কতক গুলো পড়ে রয়েছে।

বাসব সযত্নে সেগুলি কুড়িয়ে নিল।

পদার্থগুলি আর কিছুই নয়, পাতলা ছিলছিলে মোমের টুকরো।

এখানে এগুলো এল কী ভাবে!

বাসব ভ্রূকুঁচকে চিন্তা করল।

টুকরোগুলো সংখ্যায় সাতটার বেশী নয়। একটু বাঁকা ধরনের। কোনটা এক আবার কোনটা আধ স্কোয়ার ইঞ্চির সেগুলো।

টুকরোগুলো হাতে নিয়ে ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল বাসব।

শৈবাল তখন একটা পাথরের চাঙ্গড়ের উপর ঝুঁকে কী দেখছে।

—ওখানে কি এত দেখছ?

শৈবাল মুখ না তুলেই বলল, দেখে যাও এসে। মনে হচ্ছে, পদার্থটা আমাদের কোন কাজে লাগতে পারে।

বাসব এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা চওড়া পাথরের ওপর খুব একটুখানি খৈনি বা দোক্তা পাতার মিহি অংশ পড়ে আছে।

তাই তো। এ জিনিসটা এখানে পড়ে কেন? বাসব পকেট হাতড়ে একটা কাগজের টুকরো বার করে সন্তর্পণে মিহি পদার্থটা তুলে নিয়ে, মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

—চল ডাক্তার, ফেরা যাক। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে।

সন্ধ্যার পর।

বাসব শৈবালকে নিয়ে আবার রাজনারায়ণ লজে এল।

ড্রইং-রুমে প্রবেশ করেই চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাল বাসব ইন্দ্রনারায়ণের কাছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই এলেন তিনি।

বাসব মৃদু গলায় বলল, আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম মিঃ চ্যাটার্জি।

শান্ত কণ্ঠে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, না না বিরক্ত আর কী

—গোটাকতক প্রশ্ন ছিল আপনাকে জিজ্ঞেস করবার।

—বলুন ?

—এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ?

—আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমাদের বাড়ীতে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল।

—সুপর্ণবাবুই কৃষ্ণা দেবীকে হত্যা করেছেন বলে আপনি মনে করেন ?

ইন্দ্রনারায়ণের হাতে সিগারেট-কেইস্ ছিল। তার থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালেন তিনি।

তারপর বললেন, পুলিসের তাই ধারণা।

—আমি আপনার ধারণার কথা জিজ্ঞেস করছি।

—আমার! দেখুন, সে যদি সত্যি দোষ না করবে তাহলে এই ভাবে গা ঢাকা দিয়েই বা বেড়াবে কেন ?

বাসব নিজের কেইস্ থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল।

—আপনি সুপর্ণবাবুকে তো অনেক দিন থেকে চেনেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন—?

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, বাবার মুখ থেকে শুনেছি, ওর বাবা-মা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় ও কাকার সংসারে খুবই কষ্টে মানুষ হয়েছে; তবে কোন রকমে ও বি-এ পাস করেছিল। চাকরীর সন্ধানে যখন ঘোরা-ফেরা করছিল তখন বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কী ভাবে। তিনিই ওকে এখানে নিয়ে আসেন।

—হুঁ। আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আপনি হঠাৎ গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেছিলেন কেন ?

—এমনি। একঘেয়েমী ভাবটার ওপর বৈচিত্র আনবার জন্যে।

—সেদিন কোন রকম সন্দেহজনক কিছু আপনার চোখে পড়েছিল ?

—সন্দেহজনক ?

—এই ধরুন, কারুর কথাবার্তা বা চলা-ফেরার কোন রকম ব্যতিক্রম আপনি দেখেছিলেন কি ?

একটু ভেবে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, একটা জিনিস আমার চোখে পড়েছিল। কলেজ রোডের বাড়ীর দোতলার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বাগানের বাঁশ ঝাড়ের কাছে সুপর্ণর সঙ্গে রঞ্জনের কথা হচ্ছে।

—এতে সন্দেহের কি থাকতে পারে ?

—পারে। ওদের মধ্যে সম্পর্কটা আদায়-কাঁচকলায় বলেই আমরা জানি। কাজেই সে সময় যে রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে ওদের মধ্যে কথা হচ্ছিল, তাতে—

—ও। তখন কটা হবে ?

—তখন বেলা সাড়ে নটা কি পৌনে দশটা হবে।

—আচ্ছা, আপনাদের কোন মোটারকার আছে ?

এই ধরনের প্রশ্নে একটু আশ্চর্য হলেন ইন্দ্রনারায়ণ। তারপর বললেন, আছে।

—গাড়ীখানা কার ভাগে পড়েছে মিঃ চ্যাটার্জ্জি ?

—কারুর ভাগে নয়। এই বাড়ীর আর প্রত্যেকটা অস্থাবর জিনিসের মত, গাড়ীখানাও এজমালি অবস্থাতেই আছে।

—অর্থাৎ বাড়ীর যে কেউ সেখানা ব্যবহার করতে পারে ?

—হ্যাঁ।

বাসব সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, এবার গোটা কতক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব, কিছু নিশ্চয়ই মনে করবেন না ?

ইন্দ্রনারায়ণ কোন কথা বললেন না।

—আপনি কি করেন ইন্দ্রবাবু ?

—এখানকার বিখ্যাত সিগারেট ফ্যাক্টরীর লিগাল অ্যাড্ভাইসার ছিলাম। কিছুদিন হল কাজ থেকে অবসর নিয়েছি।

বাসব আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, চম্পা দেবীর এই রকম

উড়ে এসে জুড়ে বসার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত্ ?

—আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিক ফলো করতে পারিনি ?

—আমি বলছিলাম, আপনার বাবা মৃত্যুর পর এই ভাবে চম্পা দেবীকে ডাকিয়ে বিপুল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন। সে সম্বন্ধে—

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, দাদার প্রতি যথেষ্ট অবিচার বাবা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চম্পাকে এই ভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন, আমি তাতে আনন্দিতই হয়েছি।

—ধন্যবাদ মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আপনাকে আর প্রশ্ন করব না। অনুগ্রহ করে মহীতোষবাবুকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন। উইল সংক্রান্ত গোটাকতক প্রশ্ন তাঁকে করবার আছে।

ইন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহীতোষ মিত্র ঘরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

লম্বাটে ধরনের নিরেট চেহারা তাঁর। গায়ের রং কালো। বয়স চল্লিশের মধ্যেই। চোখে প্যাঁসনে, এটর্নিদের প্রিয় চশমা। অবশ্য আজকাল এ চশমার তেমন চলন নেই। তাই তাঁর চোখে কেমন বেমানান মনে হচ্ছে।

—নমস্কার। আমায় ডেকেছেন ?

মহীতোষ মিত্র বসলেন একটা কোচে।

—নমস্কার। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে। রাজনারায়ণবাবুর উইল সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

—কি জানতে চান বলুন ?

বাসব বলল, চম্পা দেবীর মুখে আমি উইলের সারমর্ম শুনেছি। কিন্তু উইলের সাক্ষী কে কে সে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারিনি !

—মৃত রাজনারায়ণবাবুর কয়েকজন বন্ধু ও আমি।

—বন্ধুরা সব কি এখানকারই লোক ?

—না। কলকাতার।

—বন্ধুদের ঠিকানা দিতে নিশ্চয়ই আপনার কোন আপত্তি নেই ?

—নিশ্চয়ই না। আমি লিখে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, কৃষ্ণা দেবীর খুনের সঙ্গে উইলের কি সম্পর্ক ?

বাসব হাসল।—একটা খুনের কিনারা করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার মিঃ মিত্র। কার সঙ্গে যে কার সম্পর্ক, তা কী আগে থেকে বলা যায়।

—তা অবশ্য ঠিক।

—উইলে আছে, কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি রায়নারায়ণ ট্রাস্টে জমা হবে! কিসের ট্রাস্ট এটি ?

—রাজনারায়ণ নিজের বাবার নামে এই দাতব্য ট্রাস্ট গঠন করে গেছেন।

—ওই ট্রাস্ট থেকে কি রকম জায়গায় চ্যারিটি করা যেতে পারে ?

—যেমন ধরুন, কোন আতুর আশ্রমে অথবা কোন স্কুল বা কলেজে—।

—ও। উপস্থিত কত মূলধন আছে এই ট্রাস্টের ?

—হাজার তিরিশেকের মত হবে।

—মাত্র! বাসব বিস্মিত কণ্ঠে বলল, রাজনারায়ণবাবুর প্রচুর টাকা ছিল। তিনি ইচ্ছে করলে সহজেই লাখ পাঁচেক টাকা দিয়ে ট্রাস্টটা গঠন করে যেতে পারতেন।

—তাতো পারতেনই। আসলে রাজনারায়ণবাবুর ধারণা ছিল, তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তি যাঁদের ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাই রায়নারায়ণ ট্রাস্টকে বড় করে তুলবেন একদিন।

—দৃষ্টিভঙ্গীটা ভাল। আচ্ছা মিঃ মিত্র, এই মার্ডারটার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

—আমার কোন ধারণাই নেই মশাই। আমি ও সম্বন্ধে প্রচুর ভেবেও কোন কূলকিনারা করতে পারিনি।

—আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ। এবার আমরা উঠব।

বাসব ও শৈবাল ড্রইং-রুম থেকে বেরিয়ে বাগানে এল।

গেটের দিকে না গিয়ে বাড়ীর পেছন দিকে বাসবকে যেতে দেখে শৈবাল বলল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

—বাগান থেকে ঢিল মেরে দোতলার কাচের জানলার শার্শি ভাঙ্গা যায় কিনা দেখতে যাচ্ছি।

—অর্থাৎ—?

—তোমার স্মরণ শক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে ডাক্তার। ভুলে গেলে চম্পা দেবীর কাচের জানলা মাঝ রাত্রে ভেঙ্গে যাওয়ায় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল! একটু খোঁজ খবর নিয়ে তাই দেখতে হচ্ছে।

ওরা আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল।

বাসব আবার বলল, ওই সেই জানলা বোধহয়! দেখছ, শার্শিটা ভাঙ্গা!

শৈবাল উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, পরের পর ঘরের সারি সারি জানলা বন্ধ। তার মধ্যে একটি জানলার খানিকটা কাচ ভাঙ্গা।

বাসব জানলার নীচের মাটির অংশটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন জায়গাটা কাদা কাদা হয়ে রয়েছে।

—আপনারা যা ভাবছেন ঠিক তা হয়নি।

চমকে মুখ ফেরাল ওরা।

হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রঞ্জন মুখার্জ্জী।

—আপনি—? বাসব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

—আমি রঞ্জন মুখার্জ্জী।

—আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার ইচ্ছে আমার ছিল। ভালই হল। আপনি কি বলছিলেন যেন?

রঞ্জন বললেন, বাঁশের ঘায়ে জানলার কাচটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

—তাই নাকি ?

—ওই দেখুন কত বড় সাইজের একটা বাঁশ পড়ে রয়েছে ওখানে।

ওরা একই সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দেখল, পর পর কতকগুলো স্থলপদ্ম গাছ, আর তারই তলায় আড়াআড়ি ভাবে পড়ে আছে একটা বেশ বড় গোছের বাঁশ।

বাসব বলল, আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি ?

—না জেনে উপায় কী বলুন না। বলতে গেলে আমার চোখের ওপরই ঘটেছে ঘটনাটা।

—কে, কে সে ? নিশ্চয়ই তার নামটা জানাতে আপনার আপত্তি নেই ?

নির্বিকার কণ্ঠে রঞ্জন মুখার্জী বললেন, এ বিষয়ে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারলাম না বলে মর্মাহত। অন্ধকার থাকায় মানুষটিকে আমি চিনতে পারিনি।

—আপনি পুলিসকে একথা জানিয়েছিলেন ?

—না। পুলিস আমার কাছে জানতে চায়নি, তাই বলিনি।

—কিন্তু এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে···

—ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। তবে কাউকে কোন কথা উপযাচক হয়ে বলা আমার স্বভাব নয়।

—তবে যে আমায় বললেন ? যাক ওকথা—চম্পা দেবীর মুখে শুনলাম, আপনি নাকি তাঁর অজান্তেই কয়েকবার চাকরী যোগাড় করে দিয়েছেন।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রঞ্জন মুখার্জী বললেন, আপনি সঠিক সংবাদ পাননি।

বাসব বলল, তা অবশ্য হতে পারে। এই হত্যা-রহস্যের কোন সূত্র আপনার জানা থাকলে আমাকে জানাতে পারেন।

—এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোন রহস্যই নেই। সুপর্ণবাবুকে খুঁজে বার করুন, তাহলেই সমস্ত গোল মিটে যাবে।

—হুঁ। আচ্ছা মিঃ মুখার্জ্জী, দুর্ঘটনার দিন সকাল বেলা কলেজ রোডের বাড়ীতে আপনার সঙ্গে সুপর্ণবাবুর কোন কথা হয়েছিল ?

—কই না। কে বললে আপনাকে ?

বাসব শান্ত গলায় বলল, কেউ বলেনি। আমি নিজে থেকেই প্রশ্ন করছি।

এবার রঞ্জন মুখার্জ্জীর মধ্যে একটু ব্যস্ততা দেখা গেল। তিনি বললেন, আমি চলি। পরে আরেকদিন আমাদের নিশ্চয়ই কথা হবে।

বাসব আর কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে।

শৈবাল ওয়াল-ক্লকটার দিক থেকে দৃষ্টি নামিয়ে জানলার দিকে তাকাল। বাসব প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হল পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে কী সব করছে। শৈবাল এতক্ষণ একটা বই নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

আরও কুড়ি মিনিট পার হল।

বাসব দরজা খুলে বেরিয়ে এল এই সময়।

ওর সারা মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

শৈবাল বলল, কি হে, আনন্দে যে একেবারে আটখানা দেখছি ?

—আটখানা। আনন্দে এখন আমি হাজারখানা হতে প্রস্তুত আছি।

—হঠাৎ—

—কতকগুলো জটিল জিনিস প্রায় সরল করে এনেছি ডাক্তার।

শৈবাল মৃদু হেসে বলল, নিশ্চয়ই তুমি আমারও জটিলতা দূর করবে ?

বাসবও হাসল।—নিশ্চয়ই। এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় প্রথম থেকে

আলোচনা করলে কতকগুলো গোলমেলে জিনিস আমাদের চোখে পড়বে। যেমন, কৃষ্ণা দেবীকে হত্যা করার স্বার্থ কী। হত্যাকারী এতে কী ভাবে লাভবান হয়েছে। কৃষ্ণা দেবী এবাড়ীর কেউ নন, যতদূর মনে হয় কোন অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি জড়িত ছিলেন না, তবু তিনি হত হলেন কেন?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল—হত্যা ঝোপের মধ্যে হয়েছে, না মৃতদেহ ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পোস্টমর্টমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ করে কৃষ্ণা দেবীকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর গলায় বা অন্য কোথাও কোন রকম চাপের দাগ পাওয়া যায়নি। বাঁ-কাঁধের ওপর ওরকম গভীর ক্ষতচিহ্ন থাকার অর্থ কি? তাছাড়া, চম্পা দেবীর ঘরের কাচভাঙ্গা, তাঁর পরিচয়পত্র চুরি করা ও তাঁকে এই অদ্ভুত কবিতাটি উপহার দেবার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক আছে কিনা—? আমি সমস্ত বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি এবং এই প্রবলেমগুলির কয়েকটি এখন আর আমার কাছে প্রবেলম নয়।

—কি রকম!

বাসব সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকবার টান দিয়ে বলল, ঝোপের মধ্য থেকে আমি কতকগুলো পাতলা কাজকরা মোমের টুকরো পেয়েছিলাম—তোমায় দেখিয়েছি। সেগুলো আমি অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করেছি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রটা সত্যিই আমার বিশেষ বন্ধু ডাক্তার। পরীক্ষা করে দেখলাম টুকরোগুলোর গায়ে ক্লোরিনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

শৈবাল বলল, ক্লোরিন গ্যাস অবশ্য মোমের ফ্লাস্ক ছাড়া আর কিছুতেই রাখা যায় না।

—এখন তুমিই বলতে পারবে, ক্লোরিন গ্যাসে একটা লোকের মৃত্যু হওয়া সম্ভব কিনা?

—নিশ্চয়ই সম্ভব। ক্লোরিন গ্যাস কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ

করলে রক্তের হিমো-গ্লোবিনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফুসফুসকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অকেজো করে দেয়। অথচ কিছুক্ষণের পরে বুঝতে পারা যায় না মৃত্যু হয়েছে ক্লোরিন গ্যাসে।

—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম, হত্যাকারী প্রথমে কৃষ্ণা দেবীকে আহত করে এবং তারপর ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে হত্যা করে। ঝোপের মধ্যে যে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি ওখানে আহত হননি। কারণ তিনি এখানে নবাগতা ছিলেন, তাঁর পক্ষে ওখানে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। জোর করে কেউ তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি চেঁচামেচি করতেন। কাজেই ধরে নিতে হবে, তাঁকে আহত করে ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নইলে কাঁধের ক্ষতচিহ্নের কোন অর্থ হয় না। এই একটা মাত্র আবিষ্কারে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল।

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল আবার, চম্পা দেবী কবিতা উপহার পাওয়া ইত্যাদি যে সব ঘটনা আমরা জানি, তার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের গভীর যোগাযোগ আছে বলে আমি মনে করি। অবশ্য যোগাযোগটা কী ধরনের তা এখন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

—একাজ কে করতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা হয়েছে তোমার ?

—একমাত্র ভগবান ছাড়া এসম্বন্ধে কোন রকম ধারণা করা এখন কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে হত্যাকারীর একটা দুর্বলতা আমি ধরে ফেলেছি।

—তার মানে ?

—ঝোপের সামনে, একটা পাথরের ওপর কালচে ধরনের মিহি খৈনি বা দোক্তা পাতার মত পদার্থ আমরা পেয়েছি—?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—।

—সেগুলো কি জান ?

—কি সেগুলো ?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কোকা।

—কোকা ! সে আবার কি ?

—কোকেন গাছের পাতা।

—কোকেন গাছের পাতা ! সে তো এক মারাত্মক জিনিস ! দক্ষিণ আমেরিকায় শুনেছি, এই পাতা এক সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি ঠিকই শুনেছ ডাক্তার। এই পাতা চিবোলে নাকি উত্তেজনাকর নেশা হয়। এক পেরুতেই দশ লক্ষের ওপর নেশাখোর এই পাতা চিবোনোতে তাদের উপার্জনের এক চতুর্থাংশ ব্যয় করে ফেলে। বোলিভিয়ার বহুলোক নিজেদের আংশিক মাইনে হিসেবে কোকা নিয়ে থাকে।

—বল কি ! কিন্তু এই কোকার মুঙ্গেরে আগমন হল কি ভাবে? আমার মনে হয় এই পাতা চিবোনোর নেশা ভারতবর্ষে কারুর নেই।

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, চিবোনোর নেশা না থাকলেও কোকার থাকতে পারে তো ?

উত্তেজিত ভাবে শৈবাল বলল, তুমি বলতে চাও, আমরা যা কুড়িয়ে পেয়েছি তা কোকার সিগারেট মিক্সচার ?

—আমি তাই বলতে চাই। বৃষ্টির জলেতে সিগারেটের উপরকার কাগজটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমরা শুধু মিক্সচারটুকু দেখতে পাই। কাজেই ধরে নিতে হবে হত্যাকারীর কোকা মিক্সচার স্মোক করে নিজের দুর্বল স্নায়ুকে উত্তেজিত করবার অভ্যাস আছে।

—তুমি বুঝলে কি করে, এই হ্যাবিটটা হত্যাকারীরই, অন্য কারুর নয় ?

—এই জন্যে, তোমার নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না, এটা একটা এক্সপেনসিভ নেশা। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া, এসিয়ায় কেন সারা ইউরোপেও এক ছটাক কোকা তুমি বাজারে

কিনতে পাবে না। পেরু, ব্রাজিল, চিলি প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেক টাকা খরচ করে বস্তুটিকে সংগ্রহ করতে হবে। কাজেই সাধারণ লোকের পক্ষে এ নেশা করা সম্ভব নয়। এটা নেশা এবং সেমটাইম অ্যারিস্ট্রোকেসিও বটে। যে লোক এত পরিকল্পনা করে গ্যাস প্রয়োগ করে কাউকে হত্যা করতে পারে, তার পক্ষেই এ নেশা করা সাজে। তাছাড়া ওই পার্টিকুলার মিক্সচার যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেখানেই বা পড়ে থাকবে কেন ?

—তুমি বলতে চাও, হত্যাকারী মার্ডার করবার পর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল।

—হয়তো মার্ডার হবার আগেই হত্যাকারী সিগারেটটার আদ্যশ্রাদ্ধ করছিল। অবশ্য আমার থিয়োরি ভুলও হতে পারে।

—কিন্তু কেন ?

—আমার মনে হয়, সে কারুর অপেক্ষায় ছিল। বোধ হয় কৃষ্ণা দেবীর আহত দেহটা যে বয়ে এনেছিল তার অপেক্ষায়। এই কথায় আরেকটা প্রশ্ন এখানে এসে পড়ে। তা হলে, হত্যাকারীর দলে কি আরেকজন লোক আছে ?

শৈবাল কথার মোড় ঘোরাল।—চম্পা দেবীর পাওয়া সেই কবিতাটা সম্বন্ধে কি সত্যি কিছু করে উঠতে পারনি ?

বাসব সিগারেটটায় দীর্ঘটান দিয়ে বলল, সত্যি এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি। পত্রলেখক কোন রসিকতা করেছেন, না সত্যি ওই আবোল-তাবোল কথাগুলোর কোন অর্থ আছে—আগে আমাকে তাই ভেবে দেখতে হবে। কবিতাটা তুমি দেখেছ ?

বাসব পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। এই দেখ—

যতদূর দেখা যায়
থৈ থৈ জল শুধু।
ঘোলাজল, নোনাজল,
ছলছল, বেনোজল।

—আমার মনে হয়—শৈবাল বলল, চম্পা দেবীকে কোন কারণে

ভয় পাইয়ে দেওয়াই হল ওই কবিতাটার উদ্দেশ্য।

—হতে পারে। বাসব একটা হাই তুলল।—চল, ওঠা যাক। ঘরে মধ্যে আর ভাল লাগছে না।

খেতে ভালো লাগে না। কিন্তু কিছু না খেলেও নয়।

কোন রকমে রাত্রের খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এল চম্পা। আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু ঘুম আসছে না চোখে। রাজ্যের চিন্তা ওকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে।

সময় কেটে যাচ্ছে। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে চম্পা। ঘুম আসবার কোন লক্ষণই নেই! ঘুম ওর সহজে হয় না আজকাল।

সশব্দে কোথায় একটা বাজল।

আর এভাবে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। তিন ঘণ্টার ওপর শুয়ে আছে। অন্ধকারটা যেন ওকে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরে আছে।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল চম্পা।

বেডরুম ল্যাম্পটা জ্বালল গিয়ে। একটা জানলা খুলে দিল তারপর। সেদিনের সেই ঘটনার পর ওকে এই গরমেও জানলা বন্ধ করেই শুতে হয়।

নীচে অন্ধকার বাগান দেখা যাচ্ছে।

থেকে থেকে জোনাকিরা জ্বলে উঠছে ওখানে-ওখানে। থমথমে রাতের নীরবতায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে ঝিঁঝিঁরা ডেকে চলেছে একটানা। চম্পার মনে পড়ে, ছোট বেলায় পড়েছিল যেন কোথায়—হেথাকার তরু, হোথাকার লতা, ঝিল্লিরা সব কাঁদে—সত্যিই কি ওরা কাঁদে? ওদের ডাকটা তাহলে ডাক নয়? কেন কাঁদে ওরা?

চম্পা অন্যমনস্ক ভাবে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল।

কতকক্ষণ তাকিয়েছিল জানে না, হঠাৎ একটা শব্দে ওর চমক ভাঙ্গল। ও মুখ ফিরিয়ে দেখল দরজার দিকে। কে যেন দরজায় নক করছে!

কেমন ভয় ভয় করতে লাগল চম্পার।

ঘরে কেউ নেই, ও একলা। সেই প্রথম দিন থেকে রাধাই ওর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। কাল সে চম্পাকে জানিয়েছিল, কয়েক-দিন শুতে আসতে পারবে না সে। বহুদিন পরে কোন এক আত্মীয় আসায় সে কয়েক দিনের ছুটি চায় ইত্যাদি—।

আবার মৃদু করাঘাত হল দরজায়।

চম্পা কাঁপা গলায় বলল, কে ?

চাপা কণ্ঠে উত্তর এল, আমি। দরজা খোল।

কে······কার গলার আওয়াজ !

ছুটে গিয়ে চম্পা দরজা খুলে দিল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সুপর্ণ। বারান্দার আলো এসে ওর মুখের ওপর পড়েছে। একি চেহারা হয়েছে ওর ! সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোলে গাঢ় কালীর রেখা। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো।

সুপর্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, চম্পা—!

ফোঁটা ফোঁটা করে অজস্র চোখের জল গাল বেয়ে ঝরে পড়ল চম্পার।—তুমি—

সুপর্ণ সবলে জড়িয়ে ধরল চম্পাকে।

রেডিয়াম-ডায়াল যুক্ত ঘড়িটার দিকে তাকাল বাসব।

কাঁটায় কাঁটায় একটা।

রাজনারায়ণ লজের বাগানে—একটা পাকুড় গাছতলায় চুপচাপ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও আর শৈবাল।

চাঁদ আজ উঠবে না। চারিদিকে জমাট অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই। অন্ধকারের মধ্যেই বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে।

শৈবাল বলল, আর তো পারা যায় না। মশায় একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললে।

বাসব বলল, ফলারের এত বড় সুযোগ পেলে কেউ কি ছাড়ে ডাক্তার ?

শৈবাল কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা জানলা খুলে গেল বাড়ীর। চৌকো আলোর রেখা ফুটে উঠল। কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে জানলার সামনে।

শৈবাল চাপা গলায় বলল, চম্পা দেবী—

—এত রাত্রে ভদ্রমহিলা জানলার সামনে কেন? বাসব নিজেকেই প্রশ্ন করল।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর চম্পা সরে গেল জানলার কাছ থেকে। ওরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল জানলার আলোটার দিকে। কিন্তু চম্পাকে আর ফিরে আসতে দেখা গেল না।

মিনিট দশেক পার হল আরো।

বাসব বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই। এস, বাড়ীর আনাচে কানাচে একটু ঘুরে আসা যাক।

ওরা এগিয়ে চলল। অন্ধকারের মধ্যে পথ ঠাহর করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ওরা তবু যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি খোঁজা-খুঁজি করে বাড়ীর পিছন দিকে এসে দাঁড়াল। একটা আমড়া গাছ উঠানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

তাকে অবলম্বন করেই ওরা উঠানে এসে নামল।

উঠান পার হয়ে, লম্বা টানা বারান্দাটা পেরিয়ে বাসব ও শৈবাল সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। সিঁড়ির ওপরকার দরজাটা নিশ্চয়ই বন্ধ। এখন কোন দিকে যাবে? কিন্তু বেশীক্ষণ চিন্তা করবার অবসর পাওয়া গেল না। সিঁড়ি দিয়ে কারা যেন নেমে আসছে মনে হল।

ওরা দুজন তাড়াতাড়ি সরে এল।

দেওয়ালের গা ঘেঁসে এমন একধারে গিয়ে দাঁড়াল ওরা, যেখানে হঠাৎ কারুর নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম।

দুজন লোক নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। অন্ধকারে তাদের দেখা যাচ্ছে না তবে একজনের হাতে একটা সিগারেট আছে বুঝতে

পারা যাচ্ছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে তারা দাঁড়াল।

খুব চাপা গলায় কথা হচ্ছে তাদের মধ্যে। বাসব ও শৈবাল কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে যে দুজন কথা কইছে, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও অন্যজন নারী।

মিনিট পাঁচেক এই ভাবে কাটার পর, দুজনে আরো কয়েক পা এগিয়ে এল। এবার কিছু কথাবার্তা শুনতে পেল ওরা। পুরুষটি সিগারেটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, এবার আমি চলি।

—এরকম দুঃসাহসের কোন মানে হয় না। মেয়েটি বলল, কেউ দেখে ফেললে কি কেলেঙ্কারী হত বলো তো?

—কি আর হত?

—না ঠাট্টার কথা নয়।

—দিনের বেলা হাজার বার দেখা হলেও কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় কি? তাছাড়া—

—বেশ, এবার তুমি যাও। তবে আমায় যা বললে—ও কথা-গুলো আর কাউকে বলা চলবে না কিন্তু।

—চুপচাপ থাকাটা কি ঠিক হবে? রহস্য যত পরিষ্কার হয়ে যায় ততই ভাল নয় কি?

—না। তুমি ভীষণ ভাবে জড়িয়ে পড়বে। ভয় আমার পুলিসকে নয়, ভয় আমার....মেয়েটির কথা শেষ হল না।

দোতলা থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল। পায়ের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথন-রত যুগল মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, ঠিক বুঝলে পারা গেল না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল আরো দুজন।

একজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।—আমার ভুল হয়নি। আমি পরিষ্কার দেখেছি দুজনকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে।

—গেল কোথায় তারা ?

এবার অবশ্য গলার আওয়াজ চিনতে কষ্ট হয় না বাসবের। একজন রামনারায়ণ অন্যজন জয়ন্ত চৌধুরী।

তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল এবার।

—কি হয়েছে জয়ন্তবাবু ? বাড়ীতে চোর এল নাকি ? আমার মনে হল, কে দৌড়ে চলে গেল আমার ঘরের পাশ দিয়ে। বক্তা রঞ্জন মুখাৰ্জ্জী।

—সেই খোঁজই তো আমরা করছি।

—আমার মনে হয়—রামনারায়ণ বললেন, তুমি ভুল করছ। এত রাত্রে কারা এখানে আসবে !

—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। আমি যা দেখেছি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জয়ন্ত চৌধুরী বললেন।

বাসব ভেবে দেখল আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। এখুনি হয়তো কেউ আলোটা জ্বেলে দিতে পারে। বাসব এগিয়ে গেল। পিছনে শৈবাল।

—দেখুন তো, আপনারা আমাদের সম্বন্ধে বলছেন কিনা ?

বাসবের কণ্ঠস্বরে সকলে অবাক হলেন। কে একজন হাত বাড়িয়ে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিল।

রঞ্জন মুখাৰ্জ্জী বললেন, একি, মিঃ ব্যানাৰ্জ্জী ! আপনি এত রাত্রে এখানে ?

সকলেই বিলক্ষণ অবাক হয়েছেন বাসব ও শৈবালের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে।

—বিশেষ প্রয়োজনেই আসতে হয়েছে মিঃ মুখাৰ্জ্জী। জয়ন্ত-বাবু বোধ হয় আমাদের দুজনকেই দেখে থাকবেন।

ওঁরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

শেষে জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, আপনি বোধ হয় ঠিকই বলছেন কিন্তু আমার যেন মনে হল দুজনের মধ্যে একজন ফিমেল ছিল।

রামনারায়ণ বললেন, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আসুন আপনারা—আমার ঘরে আসুন। কফির ব্যবস্থা করা যাক।

রঞ্জন মুখার্জ্জী বাদে আর সকলে রামনারায়ণের ঘরে এলেন।

ঘরটি বেশ বড়।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়াও, ঘরে গোটা পাঁচেক কাচের আলমারি রয়েছে। আলমারি গুলোর প্রতিটা তাকে বোতল এবং জার ঠাসা। কোন ওষুধপত্র আছে বোধ হয় তাতে।

রামনারায়ণ নিজেই হিটারে কফি তৈরী করতে ব্যস্ত হলেন।

বাসব জয়ন্ত চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছিল বলুন তো?

—দেখছেনই তো কী দারুণ গরম চলেছে। ঘুম আসছিল না। তেতলার ছাতে গেলাম একটু হাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ওখানে গিয়েও গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। ছাত থেকে নেমে এসে সবে একতলার বারান্দায় পা দিয়েছি এমন সময় মনে হল দুজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। চোর মনে করে আমি উপরে উঠে গেলাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আমি আবার নীচে এসে জামাইবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলাম উপরে।

—তারপর?

—এধার-ওধার খোঁজাখুঁজি করছি হঠাৎ আবার দেখলাম একজোড়া ছায়া নীচে নেমে গেল। আমার যতদূর মনে হয়েছে, দুজনের মধ্যে একজনের পরনে শাড়ী ছিল।

—থাক এখন ওকথা। তার চেয়ে এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। নিশ্চয়ই আমার গোটাকতক প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার আপত্তি হবে না?

—নিশ্চয়ই না। বলুন?

—দুর্ঘটনার দিন সকালে, নটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন?

—কলেজ রোডের বাড়ীতেই ছিলাম। চিঠি লিখছিলাম কলকাতার এক বন্ধুকে।

—এতক্ষণ সময় নিল চিঠি লিখতে ?

জয়ন্ত চৌধুরী হাসলেন।—এরপর হয়তো আপনি প্রশ্ন করবেন, আমি যে সত্যি চিঠি লিখছিলাম তার কোন সাক্ষী আছে কিনা।—আমি চিঠি লেখার পর কিছুটা সময় খবর-কাগজ পড়েছিলাম।

বাসব বলল, আপনার কি মনে হয় সুপর্ণবাবু সত্যিই একাজ করেছেন ?

—বাড়ীর সকলের এই ধারণা।

—কিন্তু তাঁর এতে লাভ কী। চম্পা দেবীকে তিনি ভালবাসেন। কাজেই তাঁর আত্মীয়াকে খুন করা সম্ভব কি ?

—সেটা আপনার ভেবে দেখবার কথা মিঃ ব্যানার্জ্জী। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি, মেয়েলী ব্যাপার নিয়ে পৃথিবীতে অহরহ কত খুন জখম হচ্ছে, কাজেই এই দুর্ঘটনায় অবাক হবার মত কিছু নেই।

—আপনি যেন মিন করছেন, সুপর্ণবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণা দেবীরও প্রণয় ঘটিত একটা কিছু ছিল—?

—ডেফিনিটলি আমি কিছুই মিন করতে চাই না।

কফি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। রামনারায়ণ নিজেই দুকাপ কফি বাসব আর শৈবালকে এনে দিলেন। জয়ন্ত চৌধুরী উঠে গিয়ে এক কাফ নিজের জন্য নিয়ে এলেন।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আলোচনা এগিয়ে চলল।

—আপনি কি করেন মিঃ চৌধুরী ?

—আলীপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ করি।

—হঠাৎ এসময় কলকাতা থেকে এখানে এসেছিলেন যে ?

—এমনি। অনেক দিন জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি তাই—

বাসব রামনারায়ণবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ ভাল হয়েছে আপনার কফি।

—বহুদিন ধরেই নিজের হাতে কফি তৈরী করে খাওয়া অভ্যাস। এখনও ভাল না হলে পরিতাপের কথা হত। রামনারায়ণ বললেন।

—আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জ্জী, সেদিন আপনি সকাল নটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি কোথায় ছিলেন?

—আমার রান্নাবান্না করার দিকে একটু ঝোঁক আছে। সে সময় আমি রান্নার জায়গায় ছোট বৌমার সঙ্গে ছিলাম।

—ছোট বৌমা অর্থাৎ ইন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী?

রামনারায়ণ ঘাড় নাড়লেন।

—যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে আপনাদের পারিবারিক ইতিহাস আমাকে কিছু বললে ভাল হয়।

—না, না আপত্তির আর কী আছে। বাবা নিজের দোষে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছিলেন। তাই দাদার পড়া হল না। তিনি অল্প বয়সেই অর্থ উপার্জনে মন দিলেন। আমি অবশ্য ডাক্তারী পড়ছিলাম। আমার হাউস সার্জান থাকার সময়ই বাবা মারা গেলেন। পরবর্তী কালে দাদা নিজের অধ্যবসায় ও প্রতিভার বলে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক জীবন দাদার ভাল ছিল না। বৌদি অল্প বয়সেই মারা গেলেন। বড় ছেলে দেবনারায়ণ ঝগড়া করে চিরদিনের মত চলে গেল। এমন কি তাঁর মৃত্যুটাও হল—থামলেন রামনারায়ণ।

—কথাটা শেষ করুন মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

—অবশ্য—

—অবশ্য কী—বলুন!

—এটা আমার সন্দেহ মাত্র, তবে—

—বেশ তো, আপনি আমাকে বলুন। আমি যখন পুলিসের লোক নই—

—আমার ধারণা দাদাকে খুন করা হয়েছে।

বাসব দ্রুত কণ্ঠে বলল, খুন! এ ধারণা আপনার হল কি করে?

রামনারায়ণ একটা সিগারেট ধরালেন।

উগ্র কটু গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠল।

—একটু কড়া ধরনের সিগারেট। এর গন্ধ আপনাদের অসুবিধা ঘটাচ্ছে বুঝতে পারছি। অবশ্য আমার মত পাঁড় ধূমপায়ীর এ সিগারেট ছাড়া অন্য কিছুতে সানায় না। কি বলছিলেন, আমার কি করে ধারণা হল দাদাকে খুন করা হয়েছে? একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের খালি চোখের দৃষ্টিই যথেষ্ট মিঃ ব্যানার্জ্জী।

—আপনার দাদার মৃত্যু হয়েছিল কোথায়? এবাড়ীতে নিশ্চয়ই?

—না। দাদা নিজের জমি তদারকে গিয়েছিলেন। ওখানেই তিনি মারা পড়েন।

—তারপর?

—তারপর ইন্দ্রকে আমার সন্দেহের কথা বললাম। কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান বললেন, ইট ইজ নাথিং বাট করনারি থ্রম্বোসিস। ইন্দ্র যখন এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাল না, আমি আর মিথ্যে তখন ঝামেলা বাড়ানোর সার্থকতা খুঁজে পেলাম না।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, অন্যায় করেছেন মিঃ চ্যাটার্জ্জী, পুলিসকে এবিষয় সচেতন করা আপনার কর্তব্য ছিল। যাই হোক, আপনার দাদাকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছিল বলে আপনি অনুমান করেন?

—আমার বিশ্বাস ক্লোরিন তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে বলে মনে হয়।

—ক্লোরিন?

—হ্যাঁ। আমি আপনাকে এত কথা বলতাম না, বলছি এই জন্যে যে কৃষ্ণারও মৃত্যু হয়েছে ঠিক ওই একই পদ্ধতিতে।

বাসব মৃদু কণ্ঠে বলল, দ্বিতীয়বার ভুলও আপনি করেছেন ওই সঙ্গে। এবারে পুলিসের কাছে এসত্য আপনার গোপন করে যাওয়া উচিত হয়নি।

—আমি নির্বিরোধ লোক। কোন রকম গোলমালে যেতে ভয় হয়।

—ওয়েল মিঃ চ্যাটার্জ্জী, আপনার কথামত তাহলে ধরে নিতে হয়, রাজনারায়ণবাবু ও কৃষ্ণা দেবীকে একই লোক হত্যা করেছে। কে সে ?

সিগারেটে বার কতক ঘন ঘন টান দিয়ে য়্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন রামনারায়ণ। তারপর বললেন, এটা একটা স্বার্থের কথা মিঃ ব্যানার্জ্জী। দাদার পোষ্যের অভাব ছিল না।

—আপনার কথাটা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না।

—ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলা সম্ভব হবে না।

বাসব কথার মোড় ঘোরাল।

—আপনি এখনো প্র্যাকটিশ করছেন বোধ হয় ?

—বছর দশেক হল প্র্যাকটিশ করা ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন ?

করুণ ভাবে হাসলেন রামনারায়ণ।—চিকিৎসা বিভ্রাটে স্ত্রী মারা যাবার পর, চিকিৎসা করার ওপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে গেল আমার।

—এখন তাহলে……

—এখন বাড়ীতেই ওষুধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি। ওটা আমার নেশা বলতে পারেন।

—চম্পা দেবীর মুখে শুনলাম, আপনি তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—নিশ্চয়ই পাত্র ঠিক করা ছিল ? পাত্রটি কে ?

—কোন পাত্র ঠিক করা ছিল না।

বাসব ঘড়ির দিকে তাকাল—সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

—এবার আমরা উঠি।

—সেকী—জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, এত রাত্রে কোথায় যাবেন। তারচেয়ে—

—না, না, আমাদের ফিরে যেতে কোনই অসুবিধা হবে না। ভাল কথা, রাজনারায়ণবাবুর মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে কেউ ছিল কি?

—শ্রীনাথবাবু—দাদার ম্যানেজার তাঁর কাছে ছিলেন। রামনারায়ণ বললেন।

বাসব ও শৈবাল উঠে দাঁড়াল।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, কিন্তু একটা প্রশ্ন এখনো প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে মিঃ ব্যানার্জ্জী? আপনি এতরাত্রে এবাড়ীতে এসেছিলেন কেন?

মৃদু হাসল বাসব।—আগেই বলেছি তো, নিশ্চয়ই কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা চললাম। এস ডাক্তার।

॥ নয় ॥

বেশ বেলাতে ঘুম ভাঙ্গল শৈবালের। সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল।

বাসব তখন একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। শৈবালকে উঠে বসতে দেখে বলল, তোমার শ্বশুর মশাইকে তুমি মোটেই জামাই-আদরের সুযোগ দিচ্ছ না।

—কেন?

—এর মধ্যে তিনি কতবার ঘুরে গেছেন তার হিসেব একমাত্র আমিই রাখি। ওই দেখ, তোমার জলখাবারের ডিসগুলো টেবিলের ওপর থরে থরে সজ্জিত।

—আর তুমি বোধহয় আমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলে না।

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে মুদিত চোখে বাসব বলল, বলাই বাহুল্য। কোনকালে সমস্ত হজম হয়ে গেছে আমার।

শৈবাল বাথরুমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল কাল বিলম্ব না করে।

জলযোগ শেষ করে শৈবাল বাসবের পাশে এসে বসল।

বলল, যাই বল, কালকের রাত আমাদের এক বিচিত্রতম রাত গেছে।

—হুঁ। রামনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথা বলে আমি বেশ লাভবান হয়েছি।

—আচ্ছা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা সেই যুগল আগন্তুক সম্বন্ধে তোমার মত কি?

বাসব বলল, আগে তোমার মতটা শুনি?

—আমার মতে চম্পা দেবী আর সুপর্ণবাবুকেই আমরা দেখেছি।

—সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য তোমার অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

—চম্পা দেবী এত রাত অবধি জেগেছিলেন কেন? নিশ্চয়ই কারুর অপেক্ষায় ছিলেন। অপেক্ষা সুপর্ণবাবু ছাড়া আর কার জন্যে হতে পারে?

—বলছি তো, সাদা চোখে তাই মনে হয় বটে। তবে—এখানে যে একটা বড় রকম 'তবে' রয়েছে ডাক্তার। আর ওই তবেই হল আদত কথা।

—অর্থাৎ—?

—আমরা তাদের সব কথা শুনতে পাইনি। তবে যা শুনেছি, তা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি? ছেলেটি বলেছিল একবার, 'দিনের বেলা হাজার বার দেখা হলেও কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় কি?' এখন তুমি চিন্তা করে দেখ, একথা সুপর্ণবাবু বলতে পারেন কি না। না, তা তিনি পারেন না। দিনের বেলা চম্পা দেবীর সঙ্গে সুপর্ণ-বাবুর হাজার বার দেখা হবার সম্ভাবনা কোথায়? কারণ তাঁর এখন অজ্ঞাতবাস চলেছে।

—তাহলে কি তুমি বলতে চাও, চম্পা দেবী আর কারুর সঙ্গে—

—না। কেন, চম্পা দেবী ছাড়া কি আর কোন যুবতী ও বাড়ীতে নেই?

—ইন্দ্রবাবুর মেয়ের কথা বলছ তুমি?

বাসব কিছু না বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

শৈবালের অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না যে ও আর একটা কথাও বলবে না এ সম্বন্ধে।

কিন্তু মিনিট কয়েক পরে বাসব আবার এসে চেয়ারে বসে বলল, চম্পা দেবীর জন্যে রামনারায়ণবাবু জয়ন্ত চৌধুরীকেই মনোনীত করেছিলেন।

—তাই নাকি ?

—নিশ্চয়ই তাই। সেই জন্যেই নামটা করলেন না। ওরকম ধনবতী ও রূপবতী স্ত্রী আর কার কাম্য নয় বলনা ?

শৈবাল বলল, এতে রামনারায়ণবাবুর আর কি লাভ হবে ?

বাসব প্রশ্নটা এড়িয়ে বলল, এই সিগারেটটা দেখ।

শৈবাল দেখল, ওর হাতে একটা আধপোড়া সিগারেট।

—কাল ওবাড়ী থেকে এটাকে সংগ্রহ করে এনেছি।

শৈবাল আশ্চর্য হল।

সিগারেটের টুকরোটা যে রামনারায়ণবাবুর সেই বিশ্রী গন্ধযুক্ত সিগারেট, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আশ্চর্য হবার কারণ হল, জয়ন্ত চৌধুরী, রামনারায়ণবাবু ও তার চোখ বাঁচিয়ে বাসব টুকরোটা তুলে নিয়েছিল কখন !

—তুমি টুকরোটা তুলে নিয়েছিলে কখন ?

—নিয়েছিলাম একসময় ঠিকই। শোন, এর ছাপা অংশটা পুড়ে যায়নি। এতে লেখা রয়েছে, বার্নাড হেস য্যাণ্ড কোং। আর্জেন্টিনা। অর্থাৎ এতে আমরা কোকার মিক্সচারই পাব।

শৈবাল উত্তেজিত ভাবে বলল, রামনারায়ণবাবুই তাহলে···

বাসব মৃদু হেসে বলল, চল, ওঠা যাক। একবার থানায় যেতে হবে।

কুলদীপ মেহরাকে পাওয়া গেল না।

ইন্‌স্পেক্টার লালচাঁদ ছিলেন থানায়। তাঁরই সঙ্গে মিনিট দশেক কথা কয়ে বাসব থানা থেকে বেরিয়ে এল শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে।

আসবার সময় ডাঃ রায়ের ঠিকানাটা নিয়ে নিল বাসব ইন্‌স্পেক্টারের কাছ থেকে। থানা থেকে বেশ কিছুটা দূর ডাঃ রায়ের চেম্বার।

রিক্সা করেই ওরা চলে গেল ওখানে। ওয়েটিংরুমে প্রচুর রুগীর ভীড়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মনে হয় ডাঃ রায়ের পসার ও হাতযশ খুবই।

বাসব একটা শ্লিপ লিখে পাঠাল ডাক্তারের কাছে।

ডাঃ রায় নিজেই বেরিয়ে এলেন চেম্বার থেকে।

সাদরে আহ্বান জানালেন ওদের, আসুন—ভিতরে আসুন—

সুইংডোর ঠেলে পথ করে দিলেন ওদের। বাসব ও শৈবাল তাঁর চেম্বারে প্রবেশ করল। ডাক্তারের চেম্বার হলেও ঘরটি সাজানোর ব্যাপারে যথেষ্ট রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ রায়ের চেহারাটিও শিল্পীসুলভ।

লম্বায় ছ ফুটের কাছাকাছি হবেন ভদ্রলোক। টক টকে গায়ের রং। খাঁড়ার মত নাকের উপর কালো সেলের ফ্রেমের চশমা। চোখ দুটি যেন স্বপ্নময়, লেন্সের মধ্য দিয়েও তার আভাস পাওয়া যায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা সেক্রিটেরিয়্যাট টেবিল।

টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে মহীতোষ মিত্র বসে রয়েছেন।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনজনের মধ্যে কুশল প্রশ্ন বিনিময় হল। সকলে আসন গ্রহণ করার পর ডাঃ রায় বললেন বাসবের দিকে তাকিয়ে, আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মিঃ ব্যানার্জ্জী। আপনি আমার চেম্বারে এসেছেন এ আমার সৌভাগ্য। বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?

—তেমন কিছু করতে হবে না—বাসব বলল, আপনি এও নিশ্চয়ই শুনেছেন কত বড় গুরুদায়িত্ব নিয়ে আমি আপনাদের শহরে

এসেছি। ও সম্বন্ধেই গোটাকতক প্রশ্ন আমার ছিল ডাঃ রায়।

মহীতোষ মিত্র বললেন, আমার বোধহয় এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। আমি বরং—বাসব দ্রুত কণ্ঠে বলল, আপনার সামনে সমস্ত কথাই হতে পারে মিঃ মিত্র। আপনি বসুন।

ডাঃ রায় বললেন, আমি এই খুন সম্বন্ধে আর কি বলতে পারি?

—এই খুন সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞেস করব না। আপনি ওঁদের পারিবারিক চিকিৎসক, কাজেই অন্য ধরনের দু চারটে প্রশ্ন আমার নিশ্চয়ই থাকতে পারে।

—তা পারে অবশ্য।

—রাজনারায়ণবাবু মারা যাবার পর আপনি তাঁর দেহ পরীক্ষা করেছিলেন?

—কেন, বলুন তো?

—আপনার সার্টিফিকেটের জোরেই তাঁর দেহ সৎকার হয়, তাই নয় কি?

—ঠিক আমার সার্টিফিকেটের জোরে নয়—ডাঃ রায় বললেন, আমি সার্টিফাই করার পর সিভিল সার্জন তা এপ্রুভ করেন। তখন······

—একই কথা। তাঁর দেহ পরীক্ষা করার পরও আপনার মনে হয়েছিল মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে?

—বডি অবশ্য আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিনি। আর পরীক্ষা করবারই বা কী ছিল! তাঁর শরীর সুস্থ ছিল না। হার্টের রুগী ছিলেন তিনি। হার্ট ফেল করে মারা যাওয়া তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমি রাজনারায়ণবাবুর বিশ বছর চিকিৎসা করেছি। তাঁর শরীরের আপাদমস্তক আমার নখদর্পণে ছিল।

—ধন্যবাদ ডাঃ রায়। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। আমরা এবার উঠি। পরে আবার দেখা হবে।

—উঠবেন কী রকম! এইতো এলেন। বসুন চা-টা···

—না, না ওসব হাঙ্গামা আর করবেন না। আপনার এখন

কাজের সময়। বহু রুগী অপেক্ষা করছে দেখলাম—।

মিঃ মিত্রও উঠলেন। বললেন, চলুন। আমিও যাব।

বাইরে এলেন সকলে।

ডাঃ রায় রাস্তা অবধি এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তিনজনকে।

মোড়ের মাথায় এসে মিঃ মিত্র প্রশ্ন করলেন, কোন দিকে যাবেন?

বাসব বলল, রাজনারায়ণ লজে।

—চলুন, হেঁটেই যাওয়া যাক। কাছেই—

পথে আর কোন কথা হল না।

রাজনারায়ণ লজে পৌঁছাবার পর বাসব প্রশ্ন করল, মিঃ মিত্র, ম্যানেজার শ্রীনাথবাবু লোক কেমন?

—ভাল বলেই তো শুনেছি।

—এখন বোধহয় তিনি বেকার হয়ে পড়েছেন?

—না। ইন্দ্রবাবু তাঁকে নিজের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

—তাঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

—আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?

—হ্যাঁ। দেখা হলে ভাল হয়।

মহীতোষ মিত্র একটি ভৃত্যকে ডেকে বললেন, বাবুদের হিসেব ঘরে নিয়ে যা।

একতলার বাইরের মহলে হিসেব ঘর।

বিরাট ঘরখানা।

দেওয়ালের চতুর্দিকে মাটি থেকে ছাদ অবধি কাঠের তাক। তাতে খোরা বাঁধান খাতা বোঝাই হয়ে রয়েছে। এক কালে নিশ্চয়ই ফরাশের ব্যবস্থা ছিল। এখন টেবিল চেয়ার শোভা পাচ্ছে।

একটা টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে কী সব লিখছেন শ্রীনাথ পাল।

বাসব ও শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল।

মাথা তুললেন শ্রীনাথ পাল। মুখে তাঁর তৈলাক্ত হাসি খেলে

গেল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দরজার দিকে ছুটে এলেন।

বাসব বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না শ্রীনাথবাবু। গোটাকতক প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি চলে যাব।

শ্রীনাথ পাল ঘাড় চুলকালেন। তারপর বললেন, তা হল গিয়ে, আপনাকে সাহায্য করতে পেলে আমি আনন্দিতই হব।

বাসব টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনি এখানে কত-দিন কাজ করছেন ?

—তা হল গিয়ে, বছর তেইশ তো বটেই।

এই দীর্ঘদিন আপনাকে এই ঘরেই কাজ করে কাটাতে হয়েছে বোধহয় ?

—আজ্ঞে।

—কর্তা আপনাকে বেশ ভালই বাসতেন, কি বলেন ?

—তা হল গিয়ে, বাসতেন বৈকী।

বাসব শৈবালের দিকে তাকাল। 'তা হল গিয়ে' বলাটা শ্রীনাথ-বাবুর মুদ্রাদোষ—ওরা বুঝতে পারল।

—রাজানারায়ণবাবুর মৃত্যুর সময় আপনি তাঁর কাছে ছিলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমি জানতে পেরেছি, রাজনারায়ণবাবুর স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়নি। সে সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

—স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়নি! —আকাশ থেকে পড়লেন শ্রীনাথ পাল।—তা হল গিয়ে, আপনি কি বলছেন স্যার!

—অজ্ঞ সাজবার চেষ্টা করবেন না শ্রীনাথবাবু। আমি জানি, আপনার অজানা কিছুই নেই।

—কিন্তু······

—আমার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার ভাবে বললেই ভাল করবেন। নইলে কথাটা পুলিসের কানে উঠলে—

—পুলিস—!

—ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেছে বলে মনে করবেন না। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কী ভাবে সাপ বার করতে হয়, পুলিসের লোকেরা তা জানে।

ব্যাকুল ভাবে শ্রীনাথ পাল বললেন, তা হল গিয়ে, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এসবের মধ্যে জড়িত নেই।

সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। বাসব আবার তাতে অগ্নিসংযোগ করে নিয়ে বলল, আপনি জড়িত আছেন তা একবারও আমি বলিনি। শুধু ওই বিষয়ে আপনি কী জানেন তাই আমি জানতে চাই।

—বেশ। তাহল গিয়ে আমি যা জানি বলছি। তবে—

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনার ভবিষ্যতের জামিন আমিই হয়ে রইলাম। বলুন ?

॥ ক ॥

শরীর বেশ ভেঙ্গে পড়েছে রাজনারায়ণের।

তিনি নিজেও বুঝতে পারেন।

তবু কাজকর্ম থেকে বিশ্রাম নিতে তাঁর মন চায় না। অতি অল্প বয়স থেকে আজ অবধি কাজের মধ্যে দিয়েই তাঁর দিন কেটেছে। কাজেই—

শীতটাও বেশ পড়েছে এবার চেপে।

ধান কাটবার সময় হয়ে এসেছে। অন্যান্য বারের মত এবারও তিনি কাটিনির সময় জমিতে উপস্থিত থাকতে চান।

দেওয়ালে টাঙ্গান বড় ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকালেন রাজ-নারায়ণ। কাল ১০ই। রবিবারও বটে। কাল যাওয়া চলতে পারে। রাজনারায়ণের জমিদারী মুঙ্গেরের চতুর্দিকে ছড়ান। কোথাও ১০০ বিঘে, কোথাও শ চারেক বিঘে আবার কোথাও ৫০ বিঘে মাত্র।

উপস্থিত তিনি যে জমিতে ধান কাটাতে যাবেন স্থির করেছেন, তার দূরত্ব মুঙ্গের শহর থেকে মাইল কুড়ির বেশী নয়। জায়গাটার

নাম লাকাড়কোলা। স্থানীয় ভাষায় লাকাড় এক শ্রেণীর বাঘকে বলা হয়। কাজেই চলতি কথায় লাকাড়কোলার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ব্যাঘ্র সঙ্কুল স্থান। কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। নেম ফর নেম সেক নয়। সত্যি সত্যিই ছোট এবং বড় তুই শ্রেণীরই বাঘের উপদ্রব আছে এই অঞ্চলে। না থাকার কথাও নয়। বাঘেদের বাস করবার উপযুক্ত স্থান এটি। বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের একটি শাখা সরল রেখার মত চলে গেছে মাইলের পর মাইল ধরে। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে গভীর অরণ্য। ভারত সরকারের বনজ সম্পদ। তরাই অঞ্চলে চাষ আবাদ হয়।

বহুদিন আগে।

মুঙ্গেরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখন রিচার্ড গ্রীণ। তিনি শুধু আদর্শ জেলা শাসকই ছিলেন না—একজন ভাল শিকারী হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল।

কোন আইন ঘটিত সূত্রেই রাজনারায়ণের সঙ্গে মিঃ গ্রীণের প্রথম আলাপ। এই আলাপই ক্রমে বন্ধুত্বের আকার নিল। মিঃ গ্রীণ কোথাও শিকার করতে গেলেই রাজনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

সেবার শীতটা একটু চেপে পড়েছিল।

লাকাড়কোলা অঞ্চলে অত্যন্ত বাঘের উপদ্রবের সংবাদ পেয়ে মিঃ গ্রীণ বন্দুক ঘাড়ে করে রওয়ানা হলেন। রাজনারায়ণও চললেন সঙ্গে।

পর পর তু রাত্রি চেষ্টা করেও বিগ গেমের সন্ধান পাওয়া না গেলেও, রাজনারায়ণ মুগ্ধ হলেন এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে।

তিনি মিঃ গ্রীণকে বললেন, এখানে কিছু জমি পাওয়া গেলে কিনতাম।

হেসে মিঃ গ্রীণ বললেন, এ আর এমন বড় কথা কী। এখানকার কিছু জমি বেওয়ারিশ হওয়ায় আমরা নিলাম করব ঠিক করে রেখেছি। আপনি চান বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

শহরে ফিরেই জমির বন্দোবস্ত পাকাপাকি হয়ে গেল।

সেই থেকে প্রতি বৎসর তিনি ধানকাটার সময় এখানে এসে প্রায় ছ্ মাস করে থেকে যান। সময় কাটে তাঁর শিকার করে।

কালই যাওয়া স্থির করলেন রাজনারায়ণ।

একজন চাকর তামাক নিয়ে এসেছিল।

তাকে তিনি বললেন, সরকার মশাইকে ডেকে দে।

শ্রীনাথ পাল কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, আমায় ডেকেছেন বড়বাবু?

—কাল সকালেই আমি লাকাড়কোলায় যেতে চাই। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। তৈরী থেকো।

—আজ্ঞে, তা হল গিয়ে আমি বলছিলাম আপনার শরীরটা তেমন ভাল নেই। এবার না হয়···

গড়গড়ার নলটা হাতে চেপে ধরে রাজনারায়ণ বললেন, না তা হয় না শ্রীনাথ। শরীর খারাপের অজুহাতে এতদিনের অভ্যাসটা বদলান চলে না।

—অজুহাত কি বলছেন বড়বাবু! তা হল গিয়ে, আপনার শরীরটা সত্যিই তো খুবই খারাপ।

—শরীরটা যে ভেঙ্গে পড়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমি তো চলে যেতে চাই। তোমাদের বড়মার কাছে যেতে চাই। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকাটাই কি ঠিক নয়?

কথা কটা শেষ করেই তিনি স্নেহপ্রভার অয়েল-পেন্টিংটার দিকে তাকালেন।

এরপর অবশ্য আর কথা চলে না, তবু শ্রীনাথ বললেন, ঠাণ্ডাটা একটু বেশী পড়েছে না?

—ঠাণ্ডা পড়েছে বলে শিকার পাওয়া যাবে না এমন নিশ্চয়ই কোন কথা নেই। তুমিই তো বলছিলে, কয়েকদিন আগে

আমাদের মুলতানি বয়েলটাকে নাকি বাঘে নিয়ে গেছে। তুমি তাহলে এখন এস শ্রীনাথ। ওই কথাই রইল, ভোর বেলায় রওয়ানা হয়ে পড়তে হবে।

—যে আজ্ঞে।

—ওহে শোন, রাইফেলটার সঙ্গে, আমার ডবল বারেল সর্ট গানটা নিয়ে নিতে ভুলো না যেন।

শ্রীনাথ পাল দরজার কাছ বরাবর গিয়ে পড়েছিলেন। রাজনারায়ণের কথা শুনে মাথা হেলিয়ে তিনি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বাংলোটা কাঠের তৈরী।

বছর আটেক আগে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রী লাগিয়ে বাংলোটা তৈরী করিয়েছেন রাজনারায়ণ। জঙ্গলের দেশে ইট সুলভ নয়। মুঙ্গের থেকে গাড়ী করে বয়ে আনার হাঙ্গামাও অনেক। তাই এই কাঠের বাংলোর ব্যবস্থা। ডায়নামোর সাহায্যে ইলেক্‌ট্রিকের ব্যবস্থাও আছে এখানে। খাওয়ার জলটা শুধু ঝরণা থেকে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

লাকাড়কোলায় পৌঁছেই রাজনারায়ণ প্রথমে এক পেয়ালা কফি খেয়ে নিলেন। তারপর বললেন শ্রীনাথকে, চল, দুপুরের খাওয়ার সামগ্রী জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করে আনি।

—এই এলেন। তা হল গিয়ে একটু বিশ্রাম করে গেলে বরং—

—এখন বিশ্রাম করলে শিকার ফসকে যাবে। শুনতে পাচ্ছনা, কাররারা কী রকম ডেকে চলেছে তারস্বরে।

ঘণ্টা খানেক ঘাপটি মেরে বসে থাকার পর, কাররার ঝাঁকটা ধানক্ষেতে নামার সঙ্গে সঙ্গে, প্রথম গুলিতেই একটাকে কাত করলেন রাজনারায়ণ।

বেশ গুজনদার পাখীটা। শ্রীনাথই ছাল ছাড়ালেন।

কুকারে রান্না করতে বসলেন রাজনারায়ণ নিজেই। মাংস তিনি

সময় পেলে নিজেই রেঁধে থাকেন। বেশ ভালই রাঁধেন। বিশেষ পাখীর মাংস।

কুকারে মাংস ফুটছিল। মোড়ায় বসে রাজনারায়ণ গড়গড়া টানতে টানতে কুকারের দিকে তাকিয়েছিলেন।

এই সময় রামনারায়ণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি কয়েকদিন মুঙ্গেরে ছিলেন না। গঙ্গার ওপারে কোথায় যেন গিয়েছিলেন।

তাঁকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে।

রাজনারায়ণ বললেন, একী! রাম তুমি?

—মুঙ্গেরে ফিরেই দেখি আপনি এখানে চলে এসেছেন। তাই সোজা চলে এলাম।

—কিছু বলবে নাকি?

একটু ইতস্ততঃ করে রামনারায়ণ বললেন, টাকাটার বিষয় বলছিলাম।

—ও সম্বন্ধে আমি তোমায় আগেই বলেছি। যতদিন আমি উইল করিনি ততদিন স্বতন্ত্র কথা ছিল। এখন আমার পক্ষে কাউকে কিছু দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

—কিন্তু এদিকে রিসার্চ—

—আমি মুখ্যু মানুষ। ওসব বুঝি না। এতদিন পরে যখন উইল করেছি তখন মনে হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। তারপর তোমরা টাকাটা পেলে কী করছ না করছ তা তো আর দেখতে আসছি না।

গুম হয়ে রইলেন রামনারায়ণ।

রাজনারায়ণ আবার বললেন, সারাজীবন আমি তোমাদের জন্যে সাধ্যমত করেছি কোন রকম প্রতিদানের আশা না করেই। তবু তোমরা আমাকে কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি কর তা আমার জানা নেই। তবে আমি যে কামধেনু—ইচ্ছে মতই যা ইচ্ছে দুয়ে নেওয়া চলে, সে সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা অত্যন্ত সজাগ, তা আমি জানি।

—এ আপনি কি বলছেন দাদা ?

—অন্যায় কিছু বলিনি। এই যে তুমি এসেছ, টাকার প্রয়োজনে নয় কি ? শোন রাম, সত্যি কথা বলতে কী তোমাদের ওপর আমার একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। এক এক সময় আমার ইচ্ছে করেছে, তোমাদের সকলকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে আমার সমস্ত-কিছু কোন হাসপাতালে বা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যাই।

থামলেন রাজনারায়ণ। মন তাঁর কয়েকদিন থেকেই হাল্কা হয়ে উঠেছিল। তাই এখন রামনারায়ণের কাছে আর নিজেকে চেপে রাখতে পারছেন না।

তিনি আবার বললেন, কিন্তু তা আমি করিনি। উইলে তোমাদের প্রত্যেকেরই বরাদ্দ আছে। শুধু তোমাদের কর্তব্যবোধ কতটা তা পরীক্ষা করবার জন্যে উইলে একটা ইঙ্গিত আমি ছেড়ে রেখেছি।

রামনারায়ণ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন।

—তোমরা শুনেছ মহীতোষের পরামর্শে আমি বাবার নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করেছি। আমার মৃত্যুর পর ওই ট্রাস্টকে তোমরা কতখানি বড় করে তুলতে পার সেইটাই হল তোমাদের পরীক্ষা।

—কিন্তু ট্রাস্ট বোর্ডে আপনি আমাদের কাউকেই রাখেননি।

—আমার য়্যাটর্নির ধারণা এবং আমারও তাই বিশ্বাস, তোমাদের হাতে পড়লে ট্রাস্টকে বাঁচান যাবে না। যাই হোক, এখন বিশ্রাম কর গিয়ে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরে যেও।

নিরিবিলিতে আজ দাদাকে অনেক কথা বলতে এসেছিলেন রামনারায়ণ, কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই যে ভাবে কথা আরম্ভ করলেন তাতে বিশেষ কিছু বলার ফাঁক খুঁজে পাওয়া গেল না।

তিনি বললেন, আমি আর অপেক্ষা করব না। এখুনি ফিরে যাই বরং।

রাজনারায়ণ আর কিছু বললেন না।

রামনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শ্রীনাথও এলেন পিছু পিছু তাঁর! বললেন, এতবেলায় ফিরে যাবেন ছোটবাবু? তা হল গিয়ে, খেয়ে গেলে হত না?

—এরপর আবার খাওয়া—ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন রামনারায়ণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো শুনলে শ্রীনাথ। কথাগুলো যেন পেটের মধ্যে গজগজ করছে। আগে হজম হোক, তারপর খাওয়া।

দুপুর থেকেই ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হল।

বৃষ্টির ছোঁয়ায় শীত বেড়ে উঠল চতুর্গুণ।

বিকেল তখন পাঁচটা।

চারিধার অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে। মনে হচ্ছে যেন কত রাত হয়েছে। রাজনারায়ণ একটা হ্যরিংটন চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। শিকার কাহিনী। শিকার করতে যেমন তিনি ভালবাসেন —পরের শিকারের অভিজ্ঞতা পড়তেও তাঁর তেমনি ভাল লাগে।

বইখানির মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। কিসের একটা শব্দে তাঁর চটকা ভাঙ্গল। মুখ তুলে দেখলেন রঞ্জন মুখার্জ্জী দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

গায়ের জামা কাপড় জলে সপসপ করছে রঞ্জনের। চুলের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে তাঁর গাল বেয়ে। ঠক ঠক করে কাঁপছেন তিনি।

—একী রঞ্জন! তুমি কলকাতা থেকে ফিরলে কখন?

—আজ্ঞে দুপুরে।

—যাও, যাও তাড়াতাড়ি জামা কাপড় বদলে নাও। এই বৃষ্টির মধ্যে তোমার আসা উচিত হয়নি।

রঞ্জন মুখার্জ্জী পাশের ঘরে গিয়ে কাপড় জামা বদলালেন। সঙ্গে তিনি কিছু আনেননি। শ্রীনাথবাবুর ধুতি-সার্টই তাঁকে পরতে হল। একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আবার পাশের ঘরে এলেন।

রাজনারায়ণ প্রশ্ন করলেন, মহীতোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল

নাকি ?

—আজ্ঞে না। তিনি কলকাতায় ছিলেন না।

—চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ ?

—না। চিঠিটা ওঁর অফিসেই দিয়ে এসেছি। আপনার নির্দেশও জানিয়ে এসেছি।

রাজনারায়ণ আত্মগত ভাবেই বললেন, দেবনারায়ণের মেয়ে, সেও কী তার বাপের মত চরিত্র পেয়েছে! একরোখা আর জেদি! আমার চিঠিটা সে কী ভাবে গ্রহণ করবে কে জানে! যাক, আমি তো আর দেখতে আসছি না। আমার মৃত্যুর পর মহীতোষ তাকে দেবে চিঠিখানা। ভাল কথা, রঞ্জন আমার উইলের বিষয় নিয়ে চারিধারে কী রকম কি শুনছ ?

—সকলেরই ধারণা, আপনার সমস্ত সম্পত্তি আপনি অন্য কোথাও চ্যারিটি করেছেন।

—হুঁ। চম্পার সম্বন্ধে বাড়ীর লোকদের কি অভিমত ?

—দেবনারায়ণবাবুর যে মেয়ে আছে একথা কেউই প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। আপনি সেদিন যখন সকলকে ডেকে বললেন, দেবনারায়ণবাবুর মেয়ে চম্পা দেবী হয়তো এবাড়ীতে এসে থাকতে পারেন, তখন—

—তখন ?

—তখন অনেকেই আপনার আড়ালে বিরূপ মন্তব্য করেছেন —আমার কানে এসেছে।

রাজনারায়ণ কী চিন্তা করতে লাগলেন।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল।

—তারপর—রঞ্জন ?

—আজ্ঞে।

—তোমার নিজের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলবার নেই ?

রঞ্জন মুখার্জ্জী মাথা নত করে বসে রইলেন।

—আমি জানি, সুপর্ণ আসবার পর থেকে তুমি একটু মনক্ষুণ্ণ

হয়েছ। তোমার ধারণা সুপর্ণকে আমি বেশী স্নেহ করি।

—আপনার সমস্ত কাজ আমি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি। তবু আপনি প্রাইভেট সেক্রেটারী অ্যাপয়েন্ট করলেন—

—খুবই অভাবের মধ্যে ছিল সুপর্ণ তাতো তুমি জান। তাই ওকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম। কয়েক বছর ধরে কাজ সে ভালই করছে।

আর কোন কথা হল না।

রাজনারায়ণ আবার শিকার কাহিনীতে মন বসালেন।

কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর, মন্থর পায়ে রঞ্জন মুখার্জ্জী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঢং ঢং করে নটা বাজল একসময় দেওয়াল ঘড়িটায়।

বইটা মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন রাজনারায়ণ। তখনও এক-নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। শ্রীনাথকে ডেকে বললেন, বেশী রাত করে লাভ নেই। রঞ্জনকে ডাক। খাওয়া দাওয়াটা সেরেনি।

—আজ্ঞে, তা হল গিয়ে, রঞ্জনবাবু ঘণ্টা দুয়েক আগেই চলে গেছেন।

—চলে গেছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গেল কি ভাবে? হেঁটেই গেল নাকি?

—গরুর গাড়ী করে স্টেশনে গেলেন। বললেন, ওখান থেকে সাড়ে আটটার ট্রেনটা ধরে নেবেন।

লাকাড়কোলার মাইল পাঁচেক দূর দিয়ে লুপলাইন চলে গেছে। ওখানে একটা স্টেশন আছে দশরথপুর। আপ ও ডাউন মিলিয়ে দুবার মাত্র প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দেড় মিনিট করে স্টপেজ আছে এখানে।

আত্মগত ভাবে রাজনারায়ণ বললেন, আমাকে না বলেই চলে গেল! আশ্চর্য!

অনেক রাত্রি হবে তখন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল শ্রীনাথ পালের।

কিসের একটা শব্দ হল যেন!

কান খাড়া করে রইলেন তিনি। তখনও বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

শ্রীনাথ পাল লেপটা আবার ভাল করে গায়ে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলেন। সবে তন্দ্রা এসেছে—আবার একটা শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল ছপ্ ছপ্ করে কে একজন জলে ভেজামাটির ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। নিশ্চয়ই কোন দলহারা নেকড়ে। খাবারের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

শ্রীনাথ পাল ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করলেন।

ঘুম ভাঙ্গল তাঁর বেশ বেলায়।

বৃষ্টি আর হচ্ছে না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। চারিদিকে রোদ্দুর ঝলঝল করছে।

ব্যস্ততার সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন শ্রীনাথ।

কর্তা নিশ্চয়ই অনেক আগেই উঠেছেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবছেন কে জানে?

ঘরের বাইরে এসে দেখলেন তখনও রাজনারায়ণ উঠেননি। থাক্—।

কিন্তু এত বেলা অবধি ঘুমবার তো কথা নয় তাঁর। সূর্য দেখা দেবার আগে প্রতিদিন বিছানা ছেড়ে ওঠা তাঁর অভ্যাস।

কাল সারা রাত্রি ঘুম কি তাঁর হয়নি? অসুস্থতা বোধ করেছিলেন? শেষ রাত্রির দিকে ঘুম আসায় এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি তাঁর—তাই কি?

চিন্তিত ভাবে কর্তার ঘরে প্রবেশ করলেন শ্রীনাথ।

রাজনারায়ণ বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন।

শুয়ে থাকার ভঙ্গীটা কিন্তু অস্বাভাবিক বলে মনে হল শ্রীনাথ পালের। তিনি দেহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন।

কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রাজনারায়ণের শরীর। বুকের স্পন্দনের চিহ্নমাত্র নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শ্রীনাথ পাল।

তার অনুমান করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না—রাজনারায়ণ অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছেন।

॥ দশ ॥

নিজের কাহিনী শেষ করলেন শ্রীনাথ পাল।

বাসব ও শৈবাল তন্ময় হয়ে শুনছিল।

টেবিলের ওপর মোটা একটা খাতা রাখা ছিল। শ্রীনাথ ওতেই কী সব লিখছিলেন ওদের আসার আগে। বাসব রাজনারায়ণ প্রসঙ্গ আর না তুলে, খাতার দিকে তাকিয়ে বলল, বাঃ, আপনার হাতের লেখাটিতো বেশ ?

শ্রীনাথবাবুর মুখে মোলায়েম একটা হাসি দেখা গেল।

—সকলেই আমার হাতের লেখার প্রশংসা করে।

—আপনার লেখার অভ্যাস আছে নাকি, মানে···এই সাহিত্য-টাহিত্য করা।

—ইয়ে···মানে···

—যে ভাবে গুছিয়ে গল্পটা বললেন তাতে মনে হয় আপনি লিখতে পারেন।

সারা বুককে মথিত করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শ্রীনাথবাবুর।

—চেষ্টা তো করেছিলাম, তা হল গিয়ে, হল আর কই। এখন পাড়ার ছেলে ছোকরারা ধরলে-টরলে কোন সভা-সমিতির জন্যে গান টান লিখে দিই।

—কিছু যদি মনে না করেন—বাসব বলল, আপনার কবিতার খাতাগুলো আমায় দেখাবেন।

একটু ইতস্ততঃ করে শ্রীনাথ বললেন, আমার কবিতার খাতা একটাই। তা হল গিয়ে শ-তিনেক পাতার বাঁধান খাতা।

—আমি অবশ্য কবিতার বিশেষ কিছু বুঝি না। তবু যদি দেখান, তাহলে···

টেবিলের ড্রয়ারটা টানলেন শ্রীনাথ পাল। তারপর তার মধ্যে হাত চালিয়ে দিলেন কবিতার খাতাটা বার করে আনবার জন্যে। একী—কোথায় খাতাটা!

খোঁজাখুঁজি করে সেখানা ড্রয়ারের মধ্যে পাওয়া গেল না।

চিন্তিত কণ্ঠে শ্রীনাথ পাল বললেন, তা হল গিয়ে, খাতাটা আমি এখানেই রেখেছিলাম, গেল কোথায়?

—ঘরের অন্য কোথাও থাকতে পারে। অন্যমনস্ক ভাবে ড্রয়াস থেকে বার করে আর কোথাও রেখে থাকতে পারেন।

ঘরের চতুর্দিকে খাতার সন্ধান করলেন শ্রীনাথবাবু। শেষে সেখানা পাওয়া গেল একটা তাকের পিছন দিকে।

—এই দেখুন, তা হল গিয়ে, খাতাটা ওখানে গেল কি করে?

শ্রীনাথ পালের কণ্ঠ থেকে উত্তেজনা ঝরে পড়ল।

বেশ মোটা, কালো লেদার বাইণ্ড করা খাতাটা।

বাসব খাতাটা হাতে নিয়ে বলল, ইঁদুরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হয়তো।

—সেকী মশাই! তা হল গিয়ে, ইঁদুর ড্রয়ার খুলে খাতাখানা ওখানে বয়ে নিয়ে যাবে? বাসব সে কথার উত্তর না দিয়ে খাতার পাতা উল্টাতে লাগল। সুন্দর ছাঁচের অক্ষরে পাতার পর পাতা কবিতা লেখা। প্রতিটি কবিতার তলায় তারিখ দেওয়া। পেজ-নম্বর দেওয়া রয়েছে ওপরে।

পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে থামল বাসব। পাতার নম্বর সেখানে ১৩০ অথচ পরের পাতার নম্বর ১৩৪।

বাসব বলল, এখানে গোটাকতক পাতা নেই মনে হচ্ছে।

—কই দেখি!—শ্রীনাথবাবু খাতাটা দেখে বললেন, তা হল গিয়ে,

পাতা ছেঁড়া থাকবার তো কথা নয়! আমার খাতাটা নিয়ে তা হল গিয়ে, কে যে এইভাবে নয়-নয় ছয়-ছয় করেছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আপনি কবিতা লিখতে পারেন, একথা বাড়ীর সকলে নিশ্চয়ই জানেন?

—তা হল গিয়ে, তা জানা আছে সকলের বৈকী।

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে বিরক্ত করলাম শ্রীনাথবাবু। এবার আমরা চলি। এস ডাক্তার।

হতভম্ব শ্রীনাথ পালের সামনে দিয়ে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে শৈবাল বলল, তুমি তো ভানুমতীর খেল দেখালে হে?

—কেন?

—শ্রীনাথবাবু লিখতে পারেন, তা তুমি জানলে কি করে? অনেকেই গুছিয়ে গল্প বলতে পারে, তাই বলে সবাই কিছু লেখক নয়।

—চম্পা দেবী যে কবিতা লেখা কাগজটা পেয়েছেন, তাতে যে হস্তাক্ষর আছে তার সঙ্গে শ্রীনাথবাবুর হাতের লেখার অদ্ভুত মিল দেখলাম। আন্দাজে তাই ঢিলটা ছুঁড়ে ছিলাম। লেগেও গেল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতার খাতা থেকে পাতাগুলো ছিঁড়ল কে?

—শ্রীনাথবাবু নিজেও ছিঁড়ে থাকতে পারেন।

—তা অবশ্য পারেন। তবে মনে হচ্ছে তা তিনি ছেঁড়েননি।

শৈবাল বলল, কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, কি কথা?

—তুমি রাজনারায়ণের মৃত্যু নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

—ঘামাতাম না; যদি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে ফ্লোরিনের সম্পর্ক না থাকত।

*　　　　*　　　　*

চম্পাকে আর একলা শুতে হচ্ছে না। যথা নিয়মে রাধা রাত্রে আসছে শুতে। চম্পা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এল সাড়ে নটার পর।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাধাও ঘরে এল। নিজের বিছানাটা মেঝেতে পাততে পাততে সে বলল, সকালে উঠে দেখি দরজা খোলা ছিল। আপনি রাত্রে কোথাও বেরিয়েছিলেন দিদিজী ?

একটু চুপ করে থেকে চম্পা বলল, হ্যাঁ। বেরিয়েছিলাম একবার।

—রাত্রে বেরুবেন না। কখন কী হয় বলা যায় না।

চম্পা অকারণেই রেগে উঠল, তোর এত কথায় কাজ কী!

আবার কী ভেবে বলল, দেখ রাধা, আমি রাত্রে বাইরে গিয়েছিলাম একথা কাউকে বলবি না, বুঝলি ?

—আচ্ছা, দিদিজী।

—নে শুয়ে পড়।

চম্পা আলো নিভিয়ে দিল।

রাত্রি তখন অনেক হবে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল রাধার।

আজ গরমটা যেন বেশী পড়েছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে রাধার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। বিছানায় উঠে বসল সে।

জানলার কাচ ভেদ করে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে। ঘরের অন্ধকার তাই অনেক তরল। খাটের দিকে তাকাল রাধা। কেউ নেই সেখানে। বিছানা খালি।

সে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খোলা। ভেজান রয়েছে শুধু।

চম্পা ঘরে নেই। মনে মনে হাসল রাধা।

বড় আলোটা জ্বেলে সে সোরাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কাচের গেলাসটা তুলে নিয়ে জল ঢালল তারপর।

চম্পা তাকে অনুমতি দিয়েছে, তেষ্টা পেলে সোরাই থেকে জল ঢেলে খেতে। একটা কাচের গেলাসও আনিয়ে দিয়েছে তার জন্যে।

গেটের পাশে সাইকেলটা দাঁড় করান রয়েছে।

বাসব রাস্তার অপর প্রান্তে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে আছে রাজনারায়ণ লজের গেটের দিকে।

আধ ঘণ্টার ওপর ও দাঁড়িয়ে আছে এখানে। শৈবাল সঙ্গে নেই। প্রায় রোজই রাত জেগে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। তাই আজ ইচ্ছে করেই শৈবালের ঘুম না ভাঙ্গিয়ে রাত্রের অভিযান শুরু করেছে বাসব।

চাঁদের আলোয় বিরাট রাজনারায়ণ লজের ওপর একটা রূপালী আস্তরণ পড়েছে। প্রথমে ও ঠিক করেছিল বাগানের পাঁচিল টপকে ভেতরে প্রবেশ করবে। কিন্তু কী মনে হওয়ায় একবার গেটের দিকে আসতেই ও লক্ষ্য করল, বিরাট গেটটা আধখোলা অবস্থায় রয়েছে। আর একটা সাইকেল দাঁড় করান রয়েছে তার একটু এধারে।

বাসব আগেই খবর পেয়েছিল, রাত্রে কোন কালেই গেটে দারোয়ান থাকেনি। কিছুদিন আগে অবধি দুটো কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হত বাগানে। কিন্তু তারা মরে যাওয়ার পর আর কোন নতুন ব্যবস্থা হয়নি।

এই সময় দুজন লোক গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

'মরনিং গ্লোরি'র লতায় ছাওয়া গেটের কাছটা প্রায় অন্ধকার। আগন্তুকদের ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।

মিনিট কয়েক ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের কথা হল। তারপর এক-জন বাড়ীর দিকে চলে গেলে, দ্বিতীয়জন সাইকেলটার কাছে এসে দাঁড়াল। সাইকেলটা হাতে নিয়ে দু'পা এগিয়ে তাতে চড়বার উপক্রম করতেই আগন্তুক যেন বুঝতে পারল কী একটা অঘটন

ঘটেছে। সে নীচু হয়ে সাইকেলের পিছনের চাকাটা পরীক্ষা করল।

বাসব আগেই পিছনের চাকাটা সেফটিপিন দিয়ে পাংচার করে রেখেছিল। কিন্তু এখানে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। যা দেখবার সে দেখেছে।

আগন্তুক সাইকেলের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে আর তাতে চড়ল না। হ্যাণ্ডেলটা ধরে শুধু সাইকেলটাকে টেনে নিয়ে চলল। আগন্তুক এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাসব দ্রুত পায়ে রাস্তার এ প্রান্ত দিয়ে তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। খুব বেশীদূর এগিয়ে যেতে হল না ওকে।

রাস্তা কিছু দূর সোজা যাবার পর যেখানে বাঁক নিয়েছে—সেই বাঁকের মুখ থেকে খান দশেক বাড়ীর পরের যে লাল রংএর একতলা বাড়ীখানা দেখা গেল তার সামনে এসে থামল ও।

অত্যন্ত দ্রুত আসার জন্যে হাঁপাচ্ছিল বাসব। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিল। একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল তারপর।

অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে চলেছে চম্পা।

প্রতি পদক্ষেপেই ওর বুক ভয়ে দুরু দুরু করছে। যদি কেউ দেখে ফেলে। এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিল ও, সে প্রশ্ন কি তার মনে জাগবে না?

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল চম্পা।

এবার শুধু বারান্দাটুকু পার হলেই ওর ঘর।

দ্রুত পদে এগিয়ে চলল চম্পা—কিন্তু ঘরে ঢোকবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঝনঝন করে কাচ ভাঙ্গার শব্দ ওকে বিভ্রান্ত করে তুলল।

শব্দটা এল ওরই ঘর থেকে!

সজোরে দরজাটা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল ও।

…এ কী…

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল চম্পা।

মিনিট কয়েক পার হয়েছে বোধ হয়।

বাসব থামের আড়াল থেকে দেখতে পেল, আগন্তুক সাইকেলটা টানতে টানতে এসে পৌঁছাল। পকেট থেকে চাবি বার করে, সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করিয়ে, সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বড় সাইজের একটা তালা ঝুলছে দরজায়।

আগন্তুক চাবি দিয়ে তালা খোলার উপক্রম করল—

বাসব থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে যেন, দাঁড়ান, আমি দেশলাইটা জ্বালি।

আগন্তুক ঘুরে দাঁড়াল। তার হাত থেকে চাবিটা পড়ে গেল।

সে অসংলগ্ন কণ্ঠে বলল, একী! মিঃ ব্যানার্জ্জী, আপনি এসময় এখানে?

চাবিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বাসব বলল, আমার গতিবিধির কি নিয়মসম্মত পথ আছে ডাঃ রায়?

ডাঃ রায় এবার নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন।

বললেন, কলে গিয়াছিলাম। এই ফিরছি।

—ব্যাগ না নিয়েই কলে গিয়েছিলেন! ষ্টেথিস্‌কোপ্‌টাও তো দেখতে পাচ্ছি না?

ডাঃ রায় কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আবার বাসব বলল, মিথ্যের জাল বুনে লাভ নেই ডাঃ রায়। আমি জানি আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন—আমিও রাজনারায়ণ লজেই ছিলাম।

ভীত সন্ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ডাঃ রায়।

বাসব তালাটা খুলে বলল, আসুন ভিতরে যাওয়া যাক।

চৌকাঠের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চম্পা।

রাধার দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একধারে। কাচের

গেলাসটা ভেঙ্গে গেছে। টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারি ধারে। গেলাসের কাছে কিছুটা জায়গা জলে জলময়।

একী কাণ্ড!

নিজের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে চম্পা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দৌড়াতে দৌড়াতে বারান্দা পার হয়ে, ইন্দ্রনারায়ণের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দরজায় করাঘাত করল বার কতক।

ইন্দ্রনারায়ণ দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এত রাত্রে চম্পাকে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে মা?

—কাকাবাবু, আমার ঘরে……কথাটা শেষ করতে পারল না চম্পা।

—কি হয়েছে তোমার ঘরে?

—রাধা—রাধা কী রকম ভাবে পড়ে রয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধহয়।

—সেকী! চল, চল দেখি—।

দুজনে দ্রুত পায়ে চম্পার ঘরে এলেন।

রাধার দেহটা ঠিক সেই ভাবেই পড়ে রয়েছে।

—তাইতো, একী কাণ্ড!

ইন্দ্রনারায়ণ ঝুঁকে রাধার পালস্‌টা দেখলেন।

তারপর গম্ভীর ভাবে বললেন, পালস্ পাওয়া যাচ্ছে না।

—কি বলছেন কাকাবাবু?

—বোধহয় মেয়েটা মারা গেছে।

—মারা গেছে!

—তুমি এ ঘরে আর কিছু ছোঁয়াছোঁয়ি করো না। আমি পুলিসে খবর দিচ্ছি।

—পুলিস? কেন? চম্পা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

ইন্দ্রনারায়ণ চিন্তাযুক্ত গলায় বললেন, ও যদি সত্যি মারা গিয়ে থাকে—মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সকলেই প্রচুর উৎকণ্ঠা নিয়ে চম্পার ঘরের সামনেকার বাবান্দায় এসে জড়ো হলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

পূর্বদিকের আকাশে লাল ছোপ ধরতে আরম্ভ করেছে।

খবর পেয়েই পুলিস এসে পড়ল।

ইন্‌স্পেক্টার লালচাঁদ দেহটি পরীক্ষা করলেন। দেহে প্রাণ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে রাধা।

ইন্‌স্পেক্টার সকলকেই কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। কেউই এ ব্যাপারে কোন আলোক-পাত করতে পারলেন না।

সাতটার সময় বাসবকে সঙ্গে নিয়ে কুলদীপ মেহরা এলেন।

চম্পার ঘরে তখনও মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। বাসব মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেহটা পরীক্ষা করল ও।

মিঃ মেহরা প্রশ্ন করলেন, কিসে মারা গেছে বলে আপনার মনে হয়?

—পটাসিয়াম সাইনাইডে।

—কি করে বুঝলেন?

বাসব বলল, মৃতদেহের পজিশন দেখুন। সোরাইয়ের কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ভাঙ্গা কাচের গেলাস। চারিদিকে জল ছড়িয়ে পড়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, সোরাই থেকে জল গড়িয়ে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। নইলে মৃতদেহ ওই ভাবে পড়ে থাকতো না। সায়নাইড ছাড়া এত দ্রুত মৃত্যু আর কিসে হতে পারে বলুন?

—তাহলে গেলাসে আগে থাকতেই সায়নাইড মেশানো ছিল।

—সোরাইয়ের জলেও মেশানো থাকতে পারে। জলটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

—আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন।

কুলদীপ মেহরা ব্যবস্থা করে মৃতদেহ পোস্টমর্টমে পাঠালেন।

ভাঙ্গা কাচের টুকরোগুলো ও সোরাইটা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে পাঠানো হল।

বাসব ঘরের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখছিল।

সোরাইটা রাখা ছিল একটা ছোট টুলের ওপর। সোরাইটা নিয়ে যাওয়ার পর টুলটা খালি পড়েছিল। বাসব এগিয়ে গিয়ে টুলটা পরীক্ষা করল। বহুদিন ধরে সোরাইটা তার ওপর রাখা থাকায় খানিকটা কাঠ খেয়ে গিয়ে গোল দাগ হয়ে গেছে। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল ইঞ্চি ছয়েক লম্বা সুতো টুলের একপাশে আটকে রয়েছে।

কালো সিল্ক থ্রেড।

কী মনে হওয়ায় বাসব সুতোটা তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। ঘরের চারিদিকটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিয়ে ও বারান্দায় বেরিয়ে এল।

কুলদীপ মেহরা তখন সেখানে সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

চম্পা এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মুখ বিবর্ণ।

বাসব এগিয়ে গিয়ে বলল, মিস্ চ্যাটার্জ্জী, আপনার ঘরের দরজা কি দিনের বেলা খোলাই থাকে ?

—হ্যাঁ।

—কাল দিনের বেলা সমস্তক্ষণ আপনি ঘরেই ছিলেন ?

—শুধু একবার খেতে গিয়েছিলাম। তাছাড়া অন্যান্য সময় ঘরেই ছিলাম আমি।

—সন্ধ্যার সময় ?

—সন্ধ্যার সময় নীচে ড্রইংরুমে গিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প করেছিলাম।

—কটা থেকে কটা অবধি আপনি নীচে ছিলেন ?

একটু চিন্তা করে চম্পা বলল, নীচে ছিলাম বোধ হয়, সাতটা থেকে সাড়ে নটা অবধি।

—রাধা আপনার সঙ্গেই রাত কাটাত, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলুনতো—মানে আপনি কি ভাবে দুর্ঘটনার সম্বন্ধে সচেতন হলেন ?

—আমি……চম্পা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

—বলুন। এখন প্রতিটি কথাই আমাদের কাছে মূল্যবান।

—আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কাচ ভাঙ্গার শব্দে, বেরিয়ে এসে দেখি রাধা সোরাইয়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আর কোন প্রশ্ন করল না বাসব।

মিঃ মেহরার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি বোধ হয় এখানে অপেক্ষা করবেন ?

—একটু অপেক্ষা করতে হবে। সকলের কাছ থেকে জবানবন্দীটা এখনও নেওয়া হয়নি।

—আমি এখন চলি। সন্ধ্যার পর থানায় আসছি।

নীচে নেমে এল বাসব।

সিঁড়ির মুখেই রামনারায়ণবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। উনিও বোধ হয় ওপর থেকে নেমে এসেছেন এই মাত্র!

ওকে দেখে রামনারায়ণবাবু বললেন, এসব কি হচ্ছে মশাই আমাদের বাড়ীতে ? বাসব কিছু না বলে একটা সিগারেট ধরাল।

—আমি ভেবেছিলাম, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন সমস্ত কিছুর সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি……

কথা শেষ করলেন না রামনারায়ণ। তাঁর কথায় শ্লেষের আভাস পাওয়া গেল।

—কিন্তু এখন দেখছেন পরিস্থিতিটা আরো গোলমেলে হয়ে উঠল ?—মৃদু হেসে বাসব তাঁরই কথাটা শেষ করল।

—কেন, আমি কি কিছু অন্যায় বলছি ?

—না। তবে পরিস্থিতি আর বেশীদিন গোলমেলে থাকবে না।

ব্যগ্রতায় ভেঙ্গে পড়লেন রামনারায়ণ, আপনি জানেন কে 'এই

সব কাজ করছে ? কি নাম তার ?

—ব্যস্ত হবেন না মিঃ চ্যাটার্জ্জী। আপনাকে তার নাম জানাবার আগে, আপনার কাছে যে আমার আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে।

—আমার কাছে !! আবার কি প্রশ্ন ?

—প্রশ্নের কী আর শেষ আছে।

—বলুন।

বাসব থেমে থেমে বলল, ক্লোরিন গ্যাসের ফ্ল্যাস্ক দুটো কবে খোয়া গেছে, তার সঠিক তারিখটা জানতে চাই।

—এ্যা···এসব আপনি কি বলছেন ?

—কেন, আপনার তো বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় ?

—ক্লোরিনের ফ্ল্যাস্ক···মানে···

—অবুঝ হবার চেষ্টা করে লাভ নেই মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

—কিন্তু······

সিগারেটে একটা দীর্ঘটান দিয়ে বাসব বলল, কাল রাত্রে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেলেন রামনারায়ণ। কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে তাঁর মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নিল।

—ডাঃ রায় ! কি···কি বলেছেন তিনি ?

—যা তিনি জানেন।

এবার সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লেন রামনারায়ণ। বললেন, আমায় বাঁচান বাসববাবু।

—বাঁচবার চাবিকাঠি আপনারই হাতে।

রামনারায়ণ কিছু বলার অবকাশ পেলেন না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন এই সময় জয়ন্ত চৌধুরী আর মহীতোষ মিত্র।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, জামাইবাবু, আপনি এখানে ? ওপরে যান। মিঃ মেহরা আপনার খোঁজখবর করছেন।

রামনারায়ণ ওপরে চলে গেলেন।

বাসব বলল, পোস্ট অফিসে যাব ভাবছি। একটা রিক্সা করে

নিলেই যাওয়া যাবে কি বলেন ? আমার আবার পথটা জানা নেই।

জয়ন্ত চৌধুরী কিছু বললেন না।

মহীতোষ মিত্র বললেন, চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখাচ্ছি। আমাকে ওধারেই যেতে হবে।

রাজনারায়ণ লজ থেকে বেরিয়ে তুজনে একটা রিক্সা ভাড়া করলেন।

বাসব বলল, এই সমস্ত গোলমালে আপনার কাজের খুব ক্ষতি হচ্ছে নিশ্চয়ই ?

—হচ্ছে বৈকী। রোজই কলকাতা থেকে চিঠি আসছে। এখানে আমি যত ডিটেন হচ্ছি—মক্কেলদের কাজ পেণ্ডিং থেকে যাচ্ছে তত বেশী।

—আমার মনে হয় তু এক দিনের মধ্যেই এখানকার গোলমাল মিটে যাবে।

—আপনি হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েছেন ?

বাসব হাসল।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আচ্ছা মিঃ মিত্র, ধরুন, যারা রাজ-নারায়ণবাবুর উইলে টাকা পেয়েছেন, তাঁরা যদি আবার নিজেরা উইল করে মারা যান, তাহলে সে উইল ভ্যালিড হবে কি না ?

একটু ভেবে নিয়ে মিঃ মিত্র বললেন, নিশ্চয়ই হবে। এ পয়েণ্টটা তো আমার বা রাজনারায়ণবাবুর, কারুরই মাথায় আসেনি মিঃ ব্যানার্জ্জী।

—অথচ পয়েণ্টটা কত স্বাভাবিক।—বাসব বলল, আপনি আমায় ফলো করছেন নিশ্চয়ই ? উইলে আছে, যদি কেউ মারা যায়, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে বা গুরুতর বেআইনী কাজ করে তার সম্পত্তি রায়নারায়ণ ট্রাস্টে যাবে।

—হ্যাঁ। ঠিক তাই।

—সাপোজ X নিজের সম্পত্তি Z-র নামে উইল করে, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে লাগল। তখন X-কে তার সম্পত্তি থেকে

বঞ্চিত করা যাবে কি ?

—তা যাবে। তবে Z সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে।

বাসব সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করতে করতে বলল, উইলের মধ্যে আইনের ফাঁক রয়েছে ওখানেই। আমাদের এখানে ভুলে গেলে চলবে না, X Z-রই মনোনীত ব্যক্তি।

—তাহলে উপায় ?

—আমাদের এখন দৃষ্টি রাখতে হবে এরকম সুযোগ কেউ নিচ্ছে কী না। —বাসব সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাভ ইট— *

—নো থ্যাঙ্কস। —মহীতোষ মিত্র বললেন, যে উইল পাল্টাবে, সে যদি আমার সাহায্য না নিয়ে অন্য ভাবে···

—তা কী করে সম্ভব। রাজনারায়ণবাবুর উইলে আছে, আইন-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারে আপনাদের কোম্পানীর সাহায্য নিতে হবে।

—তাও তো বটে। আপনি হঠাৎ পোস্ট অফিসে চলেছেন ?

—পোস্ট মাস্টারের কাছে যেতে হবে একবার। কিছু কাজ আছে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন মিঃ মিত্র ?

—চশমার দোকানে যাব। দেখুন না, কাল রাত্রে চশমাটা বিছানায় খুলে শুয়েছিলাম, বালিশের চাপে একটা লেন্স ফেটে গেছে।

চশমাটা পকেট থেকে বার করে দেখালেন তিনি।

পোস্ট অফিস প্রায় এসে পড়েছিল। বাসব বলল, সুপর্ণবাবুর সম্পত্তি এখন নিশ্চয়ই রায়নারায়ণ ট্রাস্টে যাবে ?

—উইলের সর্ত অনুসারে তাই যাবে।

রিক্সা থামল। সামনেই পোস্ট অফিসের লাল বাড়ীটা।

বাসব নেমে পড়ল রিক্সা থেকে। মিঃ মিত্রও নামলেন।

মহীতোষ বললেন, আপনি নিজের কাজ সেরে আসুন। আমি বরং ততক্ষণে আমার কোন চিঠি-পত্র আছে কীনা দেখে নিই।

বাসব পোস্ট মাস্টারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

ওকে খুব বেশী দূর যেতে হল না, দেখা গেল ইন্‌স্পেক্টার লাল-চাঁদ দ্রুত পায়ে ওর দিকেই আসছেন।

—কি হল ?

ইন্‌স্পেক্টার বললেন, আপনার কথামত পোস্ট মাস্টারের কাছে গিয়েছিলাম।

—তারপর ?

—তিনি খাতাপত্তর ঘেঁটে বললেন, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আজ পর্যন্ত কোন পার্শেল মুঙ্গের পোস্ট অফিসে আসেনি।

—হুঁ। তাহলে ?

—এখন আপনিই বলুন কি করা যায় ?

বাসব চিন্তিত ভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। লালচাঁদ ওকে অনুসরণ করলেন। মহীতোষ মিত্র একধারে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ছিলেন।

ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, এই দেখুন আবার এক তাগাদা এসেছে। ট্রাস্ট কমিটির মিটিং না গেলেই নয়।

লালচাঁদ বললেন, আপনি অবশ্য যেতে পারেন। পরে সমস্ত গোলমাল মিটে গেলে, আইনঘটিত ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বাসব বলল, এ পরামর্শ মন্দ নয়। আপনি দু এক দিনের মধ্যেই চলে যেতে পারেন। —রায়নারায়ণ ট্রাস্টের মিটিং বোধহয় ?

—হ্যাঁ। আমি আবার তার চেয়ারম্যান।

এই সময় দেখা গেল পোস্ট অফিসের গেট পেরিয়ে রঞ্জন মুখার্জ্জী হন হন করে এগিয়ে আসছেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল এদিকে।

কেমন যেন থতমত খেলেন তিনি।

উপযাচক ভাবেই আমতা আমতা করে বললেন, এই···ডাকটা দেখতে এসেছি। কোন চিঠি আছে কীনা আমার নামে—

বলতে বলতে তিনি অন্যধারে অদৃশ্য হলেন।

লালচাঁদ আর বাসবের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল।

॥ এগারো ॥

সিগারেটের স্তূপের সামনে বসে রয়েছে বাসব।

কপালে ওর গভীর চিন্তার রেখা। শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল।

বসতে বসতে শৈবাল প্রশ্ন করল, কি হে, কতদূর ?

বাসব রাবীন্দ্রিক স্টাইলে বলল, আর নহে বেশী দূর।

—তরী তাহলে এবার পাড়ে ভিড়বে।

—হুঁ। এসো ডাক্তার, ওবিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, যে দুজন খুন হল, তারা কেউই চাটুয্যে পরিবারের কেউ নয়। আর এও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে খুন দুটি হয়েছে চম্পা দেবীকে ঘিরেই।

—অর্থাৎ—?

—অর্থাৎ যারা খুন হয়েছে, তারা দুজনেই চম্পা দেবীর কাছাকাছির লোক। কৃষ্ণা দেবী তাঁর আত্মীয়া এবং রাধা তাঁর পরিচারিকা।

—তাইতো !

বাসব সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, আমি স্থির নিশ্চিত হয়েছি হত্যাকারী ওদের দুজনকে হত্যা করতে চায়নি।

—তবে।

—তার টার্গেট হল চম্পা দেবী। কিন্তু দুবারই সে টার্গেট মিশ করেছে।

শৈবাল আশ্চর্য হয়ে বলল, এরকম মিশ হত্যাকারীর হল কি ভাবে ?

—শোন, এই দুটো হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবে চিন্তে মোটামুটি একটা থিওরি খাড়া করেছি। যে কোন কারণেই হোক হত্যাকারী, চম্পা দেবীকে হত্যা করার মনস্থ করে এবং এই ব্যাপারে

সাহায্য করার জন্যে সে রাধাকে বেছে নেয়।

—কি বলছ তুমি? রাধাকে—!

—হ্যাঁ, এবিষয় আমার কোন দ্বিমত নেই। আমি বলছি, কেন আমি নিশ্চিত হলাম। প্রথম দিন মাঝ রাত্রে যখন কাচ ভাঙ্গার শব্দে চম্পা দেবীর ঘুম ভাঙ্গল তখন তিনি কারুর কাছ থেকে সাহায্য নেবার জন্যে বারান্দায় ছুটে গেলেন। হত্যাকারীর উদ্দেশ্য সফল হল। কারণ কাচের জানলা ভাঙ্গার উদ্দেশ্যই ছিল, চম্পা দেবীকে ঘর থেকে কয়েক মিনিটের জন্যে বার করে দেওয়া। আর সেই ফাঁকে রাজনারায়ণের লেখা চিঠিখানা চুরি করে আনা। স্বাভাবিক ভাবেই হত্যাকারী আশা করেছিল, চিঠিখানা টেবিলের ওপরই থাকবে। কিন্তু সেখানা ছিল বালিশের তলায়। যাই হোক, চম্পা দেবী ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাধা ঘরে ঢুকে রাজনারায়ণের চিঠি মনে করে টেবিলের ওপর রাখা খামে মোড়া পরিচয় পত্রটা নিয়ে সরে পড়ল। খামখানা হাতে পেয়েই হত্যাকারী গলদ বুঝতে পারল। সৌভাগ্য ক্রমে সুযোগ আবার এসে গেল। সুপর্ণবাবু কলিং বেল বাজাবার পর রাধা আবার এসে উপস্থিত হল। রাধার ওপর আমার সন্দেহ হবার অন্যতম কারণ হল, গভীর রাত্রে সে নিশ্চয়ই জেগে বসেছিল না— ঘুমচ্ছিল। কাজেই একবার কলিং বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে, কারুর উপস্থিত হবার আগেই তার উপস্থিতি সন্দেহজনক। কিন্তু রাত্রে চম্পা দেবী ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে চিঠি-খানা পায়নি। না পাবারই কথা।

—চিঠিখানা হত্যাকারী কেন চুরি করতে চেয়েছিল?

—আমার মনে হয়, চম্পা দেবীর সঙ্গে সুপর্ণবাবুর বিয়ের যে কথাটা আছে। হত্যাকারী চায়নি চম্পা দেবী তা জানতে পারুন। বোধহয় সে জানত না, রাজনারায়ণ সুপর্ণবাবুকেও একটা চিঠি দিয়ে গেছেন ওই সম্বন্ধে।

—তুমি তাহলে সুপর্ণবাবুকে সন্দেহ করছ না?

—তারপর শোন, হত্যাকারী নিজের প্ল্যান অনুসারে কাজ আরম্ভ করল কলেজ রোডের বাড়ীতে বাগানপার্টির দিন। চম্পা দেবী, সুপর্ণবাবু, কৃষ্ণা দেবী একই জায়গায় বসেছিলেন। এক সময় কৃষ্ণা দেবী উঠে গেলেন। ক্রমে সুপর্ণবাবু ও সবশেষে চম্পা দেবীও স্থান ত্যাগ করলেন। এদিকে কৃষ্ণা দেবী নিশ্চয়ই বেড়াতে বেড়াতে বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। শুনেছি বাগানের একধারটা শালগাছের জঙ্গল। স্থানটা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণা দেবী সেখানে গিয়ে পড়লে হত্যাকারী তাঁকে শক্ত কিছু দিয়ে কাঁধে আঘাত করে। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারী নিজের ভুল বুঝতে পারে। আগের দিন একই রকম দুখানা শাড়ী চম্পা দেবী বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন। সেই শাড়ী দুখানাই তারা তখন পরেছিলেন। কাজেই হত্যাকারী ওই মারাত্মক ভুলের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

—এই শাড়ীর ইতিহাস তুমি জানলে কি করে?

—কিছুক্ষণ আগে গিয়ে চারুলতা দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনিই বললেন।

—বেশ, তোমার কথাই মানলাম। যদি ভুল করেই কৃষ্ণা দেবীকে হত্যাকারী আহত করে থাকে, তাহলে তাঁকে আবার হত্যা করবার কি দরকার ছিল তার?

—দরকার ছিল। কারণ, নিশ্চয়ই কৃষ্ণা দেবী আহত হবার পূর্ব মুহূর্তে হত্যাকারীকে দেখে ফেলেছিলেন। হত্যাকারী তা বুঝতে পেরেই, তাঁর মুখবন্ধ করবার জন্যে তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

—তারপর তাঁর দেহটা কোন রকমে ওই ঝোপের মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়ে গ্যাস প্রয়োগ করা হয়, এই কথা তুমি বলতে চাও?

—কোন রকম কথাটায় আমার আপত্তি আছে—বাসব বলল, অবশ্যই দেহটা মোটরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দিন দুপুরে একটা অচেতন দেহ এতখানি দূরত্বে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া মোটরকার ছাড়া আর কিসে সম্ভব?

—এদিকটা যাহোক একরকম হল।—শৈবাল বলল, আরো প্রবলেম আমার সামনে রয়েছে। এক, সেই অদ্ভুত কবিতা। দুই, কোকা মিক্সচারের সিগারেট।

—কবিতাটা শ্রীনাথবাবুর লেখা। হাতের লেখা ও ভাষা দুই। তবে তিনি কবিতা-লেখা কাগজ চম্পা দেবীর ঘরে রেখে আসেননি। এবং কী উদ্দেশ্যে চিঠিটাকে ওখানে রেখে আসা হয়েছিল তা এখন বলতে পারছি না। কোকা মিক্সচারের সিগারেট কে খায় আমি জানি।

—রামনারায়ণবাবু নিশ্চয়ই?

—ওখানেই তোমার হিসেবে ভুল হয়েছে ডাক্তার। তুমি ভেবে বসে আছ, আমি সেদিন যে সিগারেটের টুকরোটা তোমায় দেখিয়েছি, তা বুঝি রামনারায়ণবাবুর সেই বিশ্রীগন্ধযুক্ত সিগারেট।

—তাছাড়া আর কি—?

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, যে লোক ওই ধরনের নেশা করে, সে কখনই অন্যের চোখের সামনে তা তুলে ধরবে না। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, একদিন রাত্রে রাজনারায়ণ লজে আমরা দুজন আগন্তুকের জন্যে সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে পড়েছিলাম। তাদের একজনের হাতে সিগারেট ছিল? টুকরোটা সেই সিগারেটের অংশ।

—তুমি যে বললে, তোমার অজানা নেই কে কোকা স্মোক করে?

—ঠিকই বলেছি। তুমি আগেই শুনেছ আমার কাছ থেকে, আগন্তুক দুজনের মধ্যে যে মহিলাটি ছিলেন, তিনি চম্পা দেবী নন। ছিলেন ইন্দ্রবাবুর মেয়ে মিত্রানী দেবী। এখন তুমি ভেবে দেখ মিত্রানী দেবীর কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়া স্বাভাবিক।

শৈবাল চিন্তা করতে লাগল।

বাসব আবার বলল, সুপর্ণবাবুকে এখানে কেন বাদ দিতে হবে তা তোমায় আমি সেদিন বলেছি। বুড়োদের কথা উঠতেই পারে না। কারণ তাঁরা বাপ ও দাদু, আর মহীতোষবাবু চল্লিশের

উর্ধ্বে। জয়ন্তবাবুকেও বাদ দিতে হবে। কারণ সে সময় তিনি উপর থেকে নেমে আসছিলেন আগন্তুকদের সন্ধানে। এবার তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে মিত্রানী দেবীর প্রেমিকটি কে?

—কে, রঞ্জন মুখার্জ্জী?

—কারেক্ট। ভদ্রলোকের আবার তখন ফিরে আসার কারণ হল, সকলের মনে বদ্ধমূল ধারণা করিয়ে দেওয়া যে, আগন্তুকদের মধ্যে তিনি একজন নন। তাঁকে সন্দেহ হবার পর, লালচাঁদকে বললাম পোস্ট অফিসে খোঁজ নিতে, তার নামে সাউথ আমেরিকার কোথাও থেকে কোন পার্শেল আসে কী না। শুনলাম, আসে না। একটু হতাশ হতে হল। কিন্তু রঞ্জনবাবুকে সকালে পোস্ট অফিসে দেখামাত্র মনে হল, পার্শেলটা হয়তো ডায়রেক্ট মুঙ্গেরে আসে না। প্রথমে কলকাতা বা ভারতের অন্য কোন শহরে আর্জেন্টিনা থেকে পার্শেলটা আসে। তারপর সেখান থেকে এখানে পাঠান হয়। কাজেই……

—তাহলে আর এই সিগারেটের পাহাড় করে, ধোঁয়ার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছো কেন? রঞ্জন মুখার্জ্জীকে পুলিসের হাতে তুলে দিলেই হয়।

বাসব হাসল। —সে এক বিশেষ ধরনের সিগারেট খায়, আর সেই সিগারেটের মিক্সচার আমরা দুর্ঘটনার স্থলে পেয়েছি, কাজেই তাকে হত্যাকারী বলে চালান দিলে আইন তো আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না।

—তা বটে। আচ্ছা, প্রথম দিন রাজনারায়ণ লজে আমাদের যে ওয়াচ করেছিল সে কি রাধা?

—আমার তাই মনে হয়।

এই সময় চাকরের মুখে খবর পাওয়া গেল নীচে পুলিস সাহেব এসেছেন।

ওরা দুজন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল।

বাইরের ঘরে কুলদীপ মেহরা অপেক্ষা করছিলেন।

কিছুক্ষণ ধরে তিনজনের মধ্যে অনেক বিষয় আলোচনা হল। বাসব নিজের সমস্ত সন্দেহের কথা বলল মিঃ মেহরাকে।

এক সময় মিঃ মেহরা বললেন, আপনার অনুমানই ঠিক। যদিও এখন পোস্টমর্টমের রিপোর্ট রেডি হয়নি, তবু আমি ডাক্তারদের একটা অভিমত পেয়েছি। তাঁদের মতে মার্ডার সায়নাইডের সাহায্যেই হয়েছে।

—সোরাইয়ের জলে কিছু পাওয়া গেল নাকি?

—জলে সায়নাইড মেশান ছিল। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা কথা হল, সোরাইয়ের উপর মাত্র তুজনের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। রাধা ও সুপর্ণবাবুর।

বাসব অন্যমনস্ক ভাবে বলল, চম্পা দেবীরও হাতের ছাপ থাকা উচিত ছিল। তিনি বহুবারই সোরাইটা ছুঁয়ে থাকবেন।

—তাঁর হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। আমরা সুপর্ণবাবুর নামে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করেছি।

—হুঁ। চলুন, একবার কলেজ রোডের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

—সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখন যাবেন?

—চলুন। যাব যাব করে তো ওখানে যাওয়াই হচ্ছে না। একবার বাগানটা ঘুরে ফিরে দেখতে হবে।

জীপ নিয়ে এসেছিলেন মিঃ মেহরা।

ওতে করেই তিনজন কলেজ রোডে চললেন।

মিঃ মেহরা পুরানো কথার জের টানলেন। বললেন, তারপর কি হল? প্রথমবার তো টার্গেট মিশ করল হত্যাকারী, তারপর—?

বাসব বলল, প্রথমবার সফলকাম না হয়ে, দ্বিতীয়বার চম্পা দেবীকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করল হত্যাকারী। পরিকল্পনায় কোথাও খুঁত ছিল না। চম্পা দেবী যে কোন সময় জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন। কিন্তু তা হল না। তার আগেই রাধা জল খেয়ে প্রাণ দিল। যদিও ধরে নেওয়া গেছে রাধা হত্যাকারীর দলেরই লোক ছিল, তবু যে কোন কারণেই হোক জলে বিষ মেশান

আছে, একথা তাকে জানানো হয়নি।

—এখন কি করবেন ভাবছেন ?

—ভাবছি কাল সকলকে ডেকে, একবার খোলাখুলি আলোচনা করব।

আর কোন কথা হল না।

জীপখানা যখন কলেজ রোডের সামনে এসে দাঁড়াল তখন প্রায় ছটা বাজে। মিঃ মেহরা গাড়ী নিয়ে ড্রাইভারকে দূরে অপেক্ষা করতে বললেন।

বেশ কিছুটা বাগান পেরিয়ে বাড়ীটা। ফুলের বাগান।

শাল বাগানটা বাড়ীর পিছন দিকে। বাসব শাল-বাগানের দিকে এগিয়ে চলল। পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে হয় সেখানে।

ওরা শাল বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোধহয় শ দেড়েক শাল গাছ। চারিধার ঘন অন্ধকার। দিনের বেলাও ভাল করে সূর্যের আলো ঢোকে না।

বাসব প্রশ্ন করল, এই শাল-বনটার পিছনে কোন রাস্তা আছে ?

মিঃ মেহরা বললেন, আছে একটা সরু গলি।

—চলুন গলিটা দেখে আসি।

শাল-বনের শেষেই গলিটা। এঁকে বেঁকে একধার থেকে অন্য-ধারে চলে গেছে।

মেহরা বললেন, এই পথ দিয়েই তাহলে কৃষ্ণা দেবীর দেহটাকে চালান করা হয়েছিল। এধারে লোক চলাচল……

তাঁর কথা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল—বাসব তাঁর হাত ধরে, প্রচণ্ড টান মেরে তাঁকে একটা গাছের পিছনে নিয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে শৈবালও সেখানে উপস্থিত হয়েছে !

—ব্যাপার কি ?

—সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

মিঃ মেহরা ও শৈবালের দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত হল।

চম্পা আসছে। অতি সতর্কতার সঙ্গে গলি দিয়ে এগিয়ে আসছে ও।

কুলদীপ মেহরা চাপা গলায় বললেন, একী! ভদ্রমহিলা এই অসময়ে এখানে?

চম্পা গলি থেকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে বাড়ীটার দিকে এগিয়ে চলেছে।

—মনে হচ্ছে, আপনি যার সন্ধান করছেন তার সাক্ষাত এখানে পাওয়া যাবে। চম্পা দেবী বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলে, আমরাও না হয় কাছাকাছি ঘাপটি মেরে বসে থাকি।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

চম্পা যে দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে, তারই সামনা-সামনি একটা ঝাউগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাসব, শৈবাল ও কুলদীপ মেহরা।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে।

বিরক্তিকর ভাবে মশারা মুখের চারিপাশে গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে?

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

চম্পা বেরিয়ে এল। পিছনে আরেকজন।

সুপর্ণ!

চাপা গলায় কথা বলতে বলতে দুজন এগিয়ে এল।

দু পক্ষের মধ্যকার ব্যবধান তখন হাত তিনেকের মাত্র।

এই সময়—কুলদীপ মেহরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুপর্ণর ওপর।

বাসব ও শৈবাল আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ এইরকম বিপর্যয়ের জন্যে চম্পা ও সুপর্ণ প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ওরা।

কুলদীপ মেহরা সুপর্ণর হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরাতে পরাতে বললেন, কৃষ্ণা দেবী ও রাধাকে হত্যা করার অপরাধে আমি আপনাকে

গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।

চম্পা আর্ত কণ্ঠে বলল, হত্যার অপরাধে— ?

—আমার কাছে ওয়ারেণ্ট আছে মিস্ চ্যাটার্জ্জী। আইনের চোখে আপনিও নির্দোষ নন। একজন পলাতক আসামীকে সাহায্য এবং আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আপনার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম না। —আসুন সুপর্ণবাবু।

বাসব বলল, আপনার সঙ্গে তাহলে পরে দেখা করছি মিঃ মেহরা। এখন আমরা চম্পা দেবীকে নিয়ে রাজনারায়ণ লজে ফিরব।

কুলদীপ মেহরা সুপর্ণকে নিয়ে চলে গেলেন।

কত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা।

—আসুন মিস্ চ্যাটার্জ্জী।

চম্পা এবার ভেঙ্গে পড়ল।

—আপনি ওকে বাঁচান বাসববাবু। খুন ও করেনি—একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

—আমি সাধ্যমত করব। তবে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনি সাহায্য না করলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সুপর্ণবাবুর পক্ষে দুষ্কর হবে।

—আমায় কি করতে হবে বলুন ?

—বিশেষ কিছুই না। আসুন বলছি—।

ওরা তিন জন বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

আটটার পর বাসব থানায় এল। সঙ্গে শৈবালও আছে।

লালচাঁদ ওদের অভ্যর্থনা জানালেন।

দু এক কথার পর বাসব বলল, সুপর্ণবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—বেশ তো। দারওয়াজা—হাঁকলেন লালচাঁদ।

—না, না এখানে তাঁকে আনাতে হবে না। আমি সেলে গিয়েই কথা বলতে চাই।

দারওয়াজা এসে সেলাম দিল।

—সাহেবদের নতুন আসামীর কাছে নিয়ে যাও।

দারওয়াজার সঙ্গে ওরা সুপর্ণর সেলে এল।

সুপর্ণ মুহ্যমানের মত বসেছিল। ওদের আগমনে মুখ তুলল।

বাসব বলল, আমি কলিকাতা থেকে এসেছি কৃষ্ণা দেবীর হত্যার তদন্ত করতে। আমার কথা আপনি নিশ্চয়ই চম্পা দেবীর মুখে শুনে থাকবেন?

—শুনেছি।

—আমি বিশ্বাস করি আপনি কৃষ্ণা দেবী বা রাধাকে হত্যা করেননি।

—আপনি বিশ্বাস করেন!—সুপর্ণকে এবার প্রাণবন্ত মনে হল।—কিন্তু পুলিস সে কথা বিশ্বাস করে না।

—স্বাভাবিক। সারকামস্টান্সেস আপনাকে ক্রীমিনাল করে তুলেছে। আপনি যদি কোন কিছু না লুকিয়ে প্রকৃত ঘটনাটা আমায় বলেন, কথা দিচ্ছি, পুলিসের হাত থেকে আপনাকে আমি বাঁচাব।

—কি জানতে চান বলুন?

—কৃষ্ণা দেবী যেদিন মারা যান, সেদিনকার ঘটনাটা আমায় বলুন।

সুপর্ণ বলল, কলেজ রোডের বাড়ীর পুকুরের ধারে আমি, চম্পা ও কৃষ্ণা বসেছিলাম, গল্প হচ্ছিল। এক সময় কৃষ্ণা উঠে গেল। আমিও উঠে পড়লাম, রঞ্জনবাবুর সঙ্গে কিছু কাজ ছিল সেরে নেবার জন্যে। চম্পা বাড়ীর মধ্যে গেল।

—রঞ্জনবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল নয়। তবু সেদিন কি এমন কথা ছিল আপনার তাঁর সঙ্গে?

—কৃষ্ণার বিয়ের কথা।

—বিয়ের কথা! কি রকম?

—নিশ্চয়ই শুনেছেন, কৃষ্ণার সমস্ত দায়িত্ব চম্পাই নিয়েছিল। তাই তার বিয়ের কথা আমরা ভাবছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, জয়ন্তবাবুকে এসম্বন্ধে বলব। কিন্তু চম্পার রঞ্জনবাবুকেই পছন্দ। কাজেই আমাকে তাঁর কাছে কথাটা পাড়তে হয়েছিল।

—কি উত্তর দিয়েছিলেন তিনি?

—আমার প্রস্তাব শুনে তিনি উত্তর দেন, কৃষ্ণার জন্যে ভাল পাত্র তিনি খুঁজে দেবেন।

—হুঁ। আপনার সঙ্গে রঞ্জনবাবুর সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠল কেন?

—আমি নিজেও জানি না। তবে বরাবরই লক্ষ্য করছি রঞ্জনবাবু আমাকে পছন্দ করেন না।

—আপনি এখানে কাজ নিয়ে আসবার আগে, রঞ্জনবাবুই কি রাজনারায়ণবাবুর ব্যক্তিগত কাজকর্মগুলো করতেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি আসবার পর?

—মুঙ্গেরের বাইরের কাজগুলো, মিঃ চ্যাটার্জী রঞ্জনবাবুকে দিয়ে করাতেন।

—ও। আচ্ছা তারপর কি হল, রঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর কি করলেন?

—আমি রঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে, আবার চম্পার কাছে চলে আসি। চম্পা ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথা কইছিল তখন। কৃষ্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারা গেল দুপুরের দিকে। প্রচুর খোঁজাখুঁজি হল। কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না তার। আমরা ভীষণ ভাবনায় পড়লাম। চম্পার মনের অবস্থা কী রকম শোচনীয় হয়ে উঠল বুঝতেই পারছেন। পরের দিন কৃষ্ণার মৃতদেহ পাওয়া গেল পাঁচ নম্বর গুমটির ওধারে।

—আপনি এতদিন কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন?

—আমাকে আহত করে আটকে রাখা হয়েছিল।

—কি রকম ?

—আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু—

—বিশ্বাসযোগ্য হলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। আপনি বলুন ঘটনাটা।

সুপর্ণ একটু চুপ করে থেকে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল :

॥ ক ॥

কৃষ্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না !

যদি বা পরের দিন তার সন্ধান পাওয়া গেল তাও মৃত অবস্থায়।

অবিশ্বাস্য কাণ্ড। চম্পাকে কী ভাবে সামলাবে সুপর্ণ !

কে কৃষ্ণাকে খুন করল ? কেন ?

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

সুপর্ণ শালবনের মধ্য দিয়ে বাড়ীর দিকে আসছিল। চিন্তায় ভারাক্রান্ত ওর মন।

হঠাৎ পিছন থেকে মাথায় কে প্রচণ্ড আঘাত করল।

ঘুরে পড়ে গেল সুপর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল তাও জানে না।

জ্ঞান ফিরে আসতে ও অনুভব করল, একটা দড়ির খাটিয়ার ওপর হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিক।

উঠে বসতে গেল সুপর্ণ—আষ্টে পিষ্টে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকার দরুন এক ইঞ্চি নড়তে পারল না ও। মাথায় অসহ্য ব্যথা।

বহুক্ষণ এই ভাবে পড়ে রইল সুপর্ণ। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে চিন্তার সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল ও। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ হল। তার পরই আলোর ঝলকানী। কে একজন দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল।

হাতে তার লণ্ঠন। কাছে আসতেই তাকে সুপর্ণ চিনতে পারল—রাধা।

রাধা মানে চম্পার জন্যে যে ঝি ঠিক করা হয়েছিল সে খাবার হাতে করে এল। দরজার গোড়ায় আরেকজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল সুপর্ণ। কিন্তু তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। আবছা অন্ধকারের মধ্যে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। রাধা খাবারের থালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল, আপনার হাত ও মুখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। খেয়ে নিন।

সে সুপর্ণর হাতের বাঁধন খুলে দিল। মুখের প্যাডটাও সরিয়ে নিল।

সুপর্ণ নিজের মাথায় হাত দিল। ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে।

মাথা ফেটে গিয়েছিল বোধহয়।

সুপর্ণ কোন রকমে উঠে বসল খাটিয়ায়।

উত্তেজিত গলায় বলল, আমাকে এখানে ধরে রাখা হয়েছে কেন?

—পুলিস আপনাকে সন্দেহ করেছে। হাল্কা ভাবে রাধা বলল।

—পুলিস! আমাকে!

—আপনার কী সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে মৃতদেহের কাছে। পুলিসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই আপনাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে।

সুপর্ণর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, সে এক গভীর ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছে।

ও চুপ করে বসে থাকে।

রাধা আবার বলল, খেয়ে নিন।

খেতে ইচ্ছে করছে না। পিত্তি পড়ে গেছে।

তবুও কোন প্রতিবাদ না করে খাবারের থালাটা টেনে নিল।

খেতে খেতে বলল, রাধা, চম্পা নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে পড়েছে?

মুখ বেঁকিয়ে রাধা বলল, তাঁর জন্যেই তো আপনার বিপদ আরো

বেড়ে গেল। উনি কলকাতা থেকে কাকে আনাচ্ছেন খুনীকে ধরবার জন্যে।

এক সময় খাওয়া শেষ হল।

রাধা আবার সুপর্ণর হাত, পা ও মুখ বেঁধে আলোটা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজায় তালা দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

এই ভাবে কয়েক দিন কাটল।

সুপর্ণ লক্ষ্য করল হাত ও পায়ের বাঁধনটা খুব শক্ত করে বাঁধলেও একটু আলগা থেকে যায়। হাজার হলেও রাধা মেয়ে মানুষ। যতই হোক পুরুষালী কাজ তার পক্ষে যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়।

সেদিন খাওয়া শেষ হলে রাধা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন নিজের কাজ আরম্ভ করল সুপর্ণ। হাত দুটোকে বারংবার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নাড়া দিতে লাগল দড়ি ঢিলে করবার জন্যে।

চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

কিন্তু এখন সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। এই ভাবে হাতের কসরত দেখাবার পর দড়ি একটু ঢিলে হল। ক্রমে আরো ঢিলে হল।

দড়ির ফাঁসের মধ্যে থেকে হাতটা বার করে নিল সুপর্ণ। তারপর পা দুটোকে মুক্ত করল। মুখের প্যাডও বার করে নিল। এখন ও সম্পূর্ণ বন্ধন মুক্ত। এবার ঘর থেকে বেরুতে পারলেই হয়।

খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়াল সুপর্ণ। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। চোখের ওপর একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে এল।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শরীরটাকে সামলে নিল সুপর্ণ।

ঘরে আলো নেই। অন্ধকার। তবে কয়েকদিন ধরে এখানে থাকার দরুন অন্ধকারটা তার কাছে একটু তরল হয়ে এসেছে। সুপর্ণ ঘরের চারিদিক ঘুরেফিরে বেড়াল ও সহজেই বুঝতে পারল, বাগানের শেষ প্রান্তে চাকরদের জন্যে যে কতকগুলো ঘর আছে, যার কয়েকটা ব্যবহার হয় না—তারই একখানায় ওকে বন্ধ করে

রাখা হয়েছে।

আজ রাত্রে আর রাধার আসবার সম্ভাবনা নেই। সুপর্ণ নিশ্চিন্ত ভাবে ঘরের বাইরে যাওয়ার পথের সন্ধান করতে লাগল। সামনের দরজাটায় তালা দেওয়া—কাজেই ওদিকে বিশেষ সুবিধা করা যাবে না। ও ল্যাট্রিনে এল।

ঘরের লাগোয়া ল্যাট্রিন।

সুপর্ণ বন্দী অবস্থায় কয়েকবার ল্যাট্রিনটা ব্যবহার করেছিল। ওর জানা ছিল ল্যাট্রিনের একধারে মেথর আসবার একটা দরজা আছে। উই-ধরা জীর্ণ দরজা।

নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটায় বারকতক ধাক্কা দিল সুপর্ণ। দরজাটা কাঠের বিট দিয়ে বন্ধ করা ছিল। প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করার মত শক্তিও ছিল না তার। দরজার একটা পাল্লা ভেঙ্গে পড়ল।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

সকলের চোখ বাঁচিয়ে সুপর্ণ সেই রাত্রেই চম্পার কাছে উপস্থিত হল। চম্পাই ওকে কলেজ রোডের বাড়ীতে লুকিয়ে রাখল।

* * * *

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল বাসব। তারপর বলল, রাধার সঙ্গে যে লোকটি এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন ?

সুপর্ণ বলল, ঘরের মধ্যে সে একবারও ঢোকেনি। দরজার বাইরে আমার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। বেশ বলবান চেহারা। বেঁটে নয়। আর কিছু আমি তার সম্বন্ধে বলতে পারব না।

—হুঁ। আচ্ছা, আপনি যেখানে বন্দী ছিলেন সেখানে কোন সোরাই ছিল কি ? এই রকম অদ্ভুত প্রশ্নে সুপর্ণ ও শৈবাল দুজনেই অবাক হল।

—হ্যাঁ ছিল।

—আপনি সেই সোরাই থেকে জল খেয়েছিলেন ?

—খেয়েছিলাম। রাধা খাবারের সঙ্গে জল আনত না। শুই সোরাই থেকেই আলগোছে জল খেতে হত।

—এখন আমরা চললাম সুপর্ণবাবু—বাসব বলল, দেখা যাক, কতদূর কী করে উঠতে পারি।

সুপর্ণ আর কিছু বলল না।

বাসব ও শৈবাল সেল থেকে বেরিয়ে এল।

অফিস ঘরে ফিরে এল ওরা। লালচাঁদ চা আনিয়ে রেখেছিলেন। পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, কিছু সূত্রটুত্র পেলেন ?

—একেবারেই যে পাইনি, তা নয়। ভাল কথা, সুপর্ণবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, একথা রাজনারায়ণ লজের কেউ যেন জানতে না পারেন।

—চম্পা দেবী তো জানেন।

—তিনি কাউকে কিছু বলবেন না।

॥ বার ॥

বাসব রাজনারায়ণবাবুর মোটরটা গিয়ে পরীক্ষা করল।

কনভার্টেবল ডজ। থার্টি এইট মডেল।

মুঙ্গেরের মত ছোট শহরেও, এই মডেলের গাড়ী আর চলে না। এখানে এখন লেটেস্ট মডেলের হিন্দুস্থান আর ফিয়েটের ছড়াছড়ি। গাড়ীখানা বদলে, একটা আধুনিক ভাল গাড়ী কেনবার ইচ্ছে রাজনারায়ণের ছিল। কিন্তু কিনব কিনব করেও আর কিনে ওঠা হয়নি।

চাকরদের কোয়ার্টারের কাছেই গ্যারেজ।

খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বাসব স্টিয়ারিং, ব্রেক, দরজা ও অন্যান্য কয়েক স্থান, বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা হাতের ছাপ সংগ্রহ করল।

হাতের ছাপ তোলার যন্ত্রপাতি ও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

শৈবাল এবিষয় ওকে সাহায্য করল।

গ্যারেজের চাবিটা শ্রীনাথবাবুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল বাসব। চাবিটা নেবার সময় বাসব তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, সেদিন কলেজ রোডে গাড়ীটা কেউ নিয়েছিল বলে জানেন?

—এক গাড়ীতে সকলে আঁটবে না বলে, তা হল গিয়ে সকলে রিক্সা করেই এখান থেকে ওখানে গিয়েছিলেন।

—গাড়ী নিশ্চয়ই গ্যারেজেই ছিল।

—তা হল গিয়ে গাড়ীটা, গাড়ী বারান্দাতেই রাখা ছিল। পরের দিন রঞ্জনবাবু, তা হল গিয়ে গ্যারেজে তুলে রাখেন।

—এ বাড়ীতে কে কে গাড়ী চালাতে পারেন?

শ্রীনাথ বললেন, তা হল গিয়ে, রঞ্জনবাবু ছাড়া আর কেউ পারেন না। অবশ্য কর্তা পারতেন।

—ড্রাইভার আছে?

—না।

বাসব আর কোন প্রশ্ন করেনি।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে, একটা পাকুড় গাছতলায় দাঁড়াল বাসব।

শৈবাল প্রশ্ন করল, এবার বাড়ী ফিরবে তো?

—না। একটু কাজ বাকী আছে ডাক্তার।

—মোটরটা আবার পরীক্ষা করবে নাকি?

—সুপর্ণবাবু যে ঘরে বন্দী ছিলেন, সেই ঘরের দরজাটা একবার পরীক্ষা করতে চাই।

—দরজাটা!

—হুঁ।

—কিন্তু সারি সারি অনেকগুলো ঘর দেখা যাচ্ছে, তুমি বুঝবে কি করে, কোনটায় সুপর্ণবাবুকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

বাসব মৃদু হেসে বলল, বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে হবে। আমরা

এধারের বহুদিন থেকে বন্ধ থাকা ঘরগুলোর ল্যাট্রিন পরীক্ষা করব। যে ল্যাট্রিনের মেথর-ঢোকার দরজাটা ভাঙ্গা দেখতে পাব—বুঝতে হবে ওখানেই সুপর্ণবাবু বন্দী ছিলেন।

ওরা সারভেণ্ট কোয়ার্টারের পিছন দিকে আসতেই দেখতে পেল একটা ঘরের মেথর-ঢোকবার দরজা আধভাঙ্গা অবস্থায় ঝুলছে।

—এস ডাক্তার, ওই সিংহদ্বার দিয়েই আমরা ভেতরে সেঁধিয়ে যাই।

ওরা ভাঙ্গা দরজা দিয়ে ল্যাট্রিন পার হয়ে ঘরে এল।

ঘরটা দায়সারা ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখবার আগ্রহও বাসবের নেই।

বাইরে যাবার দরজাটা ভেজান ছিল।

ওরা দরজা খুলে বারান্দায় এল। দেখা গেল সেই পাকুড় গাছটার কাছাকাছিই একটা ঘর।

দরজার কড়ায় চাবি সমেত একটা তালা ঝুলছে।

বাসব বলল, চাবি খুলে খাবার দিতে এসে পাখী উড়ে গেছে দেখতে পেয়ে, রাধা ও সেই লোকটি তালাচাবি ফেলে রেখেই ভীত ভাবে সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ে।

এরপর দরজার কড়া, তালার উপরটা, কড়ার আসপাশের জায়গাগুলো থেকে আরো কয়েকটা হাতের ছাপ সংগ্রহ করল বাসব।

কাজ ওদের শেষ হল।

সারাটা দুপুর ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো নিয়ে ব্যস্ত রইল বাসব।

সোরাইয়ের ওপর রাধার যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, তার একটা কপি থানায় ফোন করে লালচাঁদের কাছ থেকে আনিয়ে নিল বাসব।

চারটের পর ও যখন শৈবালের কাছে এল তখন ওকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

শৈবাল বলল, খুব হাসিহাসি মুখ দেখছি। হেরাহেরি হয়ে

এসেছে বোধ হয় ?

—হ্যাঁ, ডাক্তার। আমার থিওরি বানচাল না হলে, মুঙ্গেরে অদ্যই আমাদের শেষ রজনী।

—অর্থাৎ—?

—অর্থাৎ হত্যাকারী আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। শুধু তাকে হাতে নাতে ধরবার একটা পরিকল্পনা আমি করছি।

—কে—কে সে ?

বাসব অল্প একটু হেসে সিগারেট ধরাল।

সন্ধ্যার পর বাসবের আহ্বানে সকলে সমবেত হয়েছেন ড্রইংরুমে।

বাসব কোন রকম ভূমিকা না করেই আরম্ভ করল, আপনারা অনেকেই আমার উপর আস্থা হারিয়েছেন বুঝতে পারছি। হত্যাকারীকে ধরা তো দূরের কথা, বলতে গেলে আমারই চোখের ওপর আরেকটা খুন হয়ে গেল। আমি আমার অক্ষমতায় লজ্জিত। তবে আমি বলব আপনারা আমার সঙ্গে যে অসহযোগিতা করেছেন, তার জন্যেই আমার কাজের বিঘ্ন ঘটেছে।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন ?

—বেশ। এবার আমি পরিষ্কার ভাবেই এক এক করে বলছি। প্রথমে রামনারায়ণবাবুর কথা ধরা যাক। আশা করেছিলাম উনি নিজে থেকেই সমস্ত কিছু আমার কাছে স্বীকার করবেন। কিন্তু তা তিনি করেননি! এখন…

—প্লীজ মিঃ ব্যানার্জ্জী—রামনারায়ণ করুণ কণ্ঠে বললেন, ওকথা এখানে আলোচনা করে লাভ নেই। আমি আপনাকে বলতামই, মানে…

—আমি দুঃখিত মিঃ চ্যাটার্জ্জী—আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার তৈরী ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে রাজনারায়ণবাবু ও কৃষ্ণা দেবী নিহত হয়েছেন।

রামনারায়ণ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাসব তার আগেই আবার

বলল, না, প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করবেন না। প্রমাণ না পেয়ে এ কথা বলিনি। ডাঃ রায়ের কাছ থেকে সত্তোর হাজার টাকা আপনি নিয়েছিলেন, ক্লোরিনের সাহায্যে কিছু একটা তৈরী করার জন্যে!

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, বাবা সহজ ভাবে মারা যান নি। একী বলছেন আপনি!

—প্রশ্ন তো ওখানেই। আপনি এ কথা শুনেছিলেন, তবু তাঁর মৃতদেহ সিরিয়াসলি পরীক্ষা করান নি! কেন?

—না…মানে…বাবা খুনই বা হতে যাবেন কেন?

—চমৎকার বলেছেন। অথচ দেখুন এইসব কথাগুলো আমার জানা দরকার কিন্তু পুরোপুরি ভেঙ্গে আপনি আমায় কিছুই বলেন নি। রামনারায়ণবাবু, গ্যাস ফ্ল্যাস্ক দুটো সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

—আমার ও বিষয় কিছু বলবার নেই বাসববাবু।

বাসব পকেট থেকে একটা সিগারেটের টুকরো বার করল।

সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, এই টুকরোটা কোন সাধারণ সিগারেট নয়। দক্ষিণ আমেরিকার নেশাবাজদের কাছে এটি একটি লোভনীয় বস্তু। কোকেনের পাতার বিশেষ এক মিক্সচার দিয়ে এই সিগারেট প্রস্তুত। রঞ্জনবাবু, এই উত্তেজনাকর নেশা আপনি কতদিন ধরে করছেন?

নির্বিকার ভাবে রঞ্জন মুখার্জ্জী বললেন, অনেক দিন ধরে।

—বলতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই, এই নেশাটি আপনি ধরেছেন কি ভাবে?

—নিশ্চয়ই না। আমি তখন কলেজে পড়তাম। ব্রিটিশ গায়নার একটি নিগ্রো ছেলে আমার সঙ্গে পড়ত। তারই কাছে আমি এই সিগারেটের সন্ধান পেয়েছিলাম।

—সেই বোধহয় আপনাকে আর্জেন্টিনার রেমণ্ড অ্যাণ্ড হেস কোম্পানীর ঠিকানা দিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কৃষ্ণা দেবীর মৃতদেহ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে আমি এই সিগারেটের কিছু মিক্সচার পেয়েছি। ও সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

রঞ্জন মুখার্জ্জী একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, কৃষ্ণা দেবীকে খুঁজতে খুঁজতে আমি ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম। ঝোপের মধ্যে আমি তাঁর মৃতদেহ দেখতে পাই। আমার ভয় হয়। আমি তাড়াতাড়ি চলে আসি ওখান থেকে।

—আপনি পুলিসকে বা আমাকে এ বিষয় জানান নি কেন?

—কারণ আমার মনে হয়েছিল আপনারা আমাকে সন্দেহ করবেন।

—ধন্যবাদ মিঃ মুখার্জ্জী। আপনার সত্যি কথা বলার সাহস দেখে আমি আনন্দিত হলাম। আর একটা প্রশ্ন আছে, আপনার সামগ্রিক ব্যবহারটাই কেমন সন্দেহজনক। যেমন, চম্পা দেবীর জানলার কাছ ভাঙ্গা হয়, সেদিন রাত্রে আপনি বাগানে উপস্থিত ছিলেন। যেমন, এক রাত্রে আপনি মিত্রানী দেবীর সঙ্গে কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কিছু বলবেন, এ সম্বন্ধে?

মিত্রানী নত মুখে বসেছিল।

ইন্দ্রনারায়ণ তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

এবার একটু ইতস্ততঃ করে রঞ্জন মুখার্জ্জী বললেন, আমায় ক্ষমা করবেন। এতগুলো লোকের সামনে কিছু বলতে পারব না। পরে আপনাকে সমস্ত জানাব।

বাসব তাঁকে আর কিছু বলল না। কয়েক মিনিটের জন্যে ঘরে পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল।

জয়ন্ত চৌধুরী কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

চম্পা উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি কিছু বলতে চাই—ওর গলা কাঁপছে।

বাসব বলল, বলুন?

—আমার ভয় হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে একটা

গভীর ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। কেউ আমায় প্রাণে মারতে চায়।

—সে কী মা! তোমায় কে প্রাণে মারতে চাইবে? ইন্দ্র-নারায়ণ বললেন।

—আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না কাকাবাবু। আমার বার বার মনে হচ্ছে, যা কিছু হয়েছে সমস্ত আমাকে কেন্দ্র করে। হত্যাকারী আসলে আমাকেই খুন করতে চায়।

রামনারায়ণ বললেন, এ তোমার ভুল ধারণা ভাই।

—হয়তো তাই। তবু যদি আমি হঠাৎ মারা যাই—তার আগে—

—তার আগে?

চম্পার কথার শেষটা শোনার জন্যে সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

—তার আগে আমি নিজের সম্পত্তি উইল করতে চাই।

এবার বাসব বলল, উইল করতে চান আপনি!

—হ্যাঁ, মিঃ ব্যানার্জ্জী। কালই। মহীতোষবাবু উপস্থিত রয়েছেন। আইনের দিকে কোন রকম গোলমাল হবার সম্ভাবনা নেই। আপনি ও শৈবালবাবু হবেন আমার উইলের অন্যতম সাক্ষী।

কথাটা শেষ করেই চম্পা দ্রুত প্রস্থান করল সেখান থেকে।

এই নাটকীয় পরিস্থিতির জন্যে কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই চম্পার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * *

ঝিল্লীর ঐক্যতান শোনা যাচ্ছে।

সকলে এক যোগে যেন কিছু বলতে চাইছে।

কোন অশুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত করছে কি?

সশব্দে কোথায় এগারোটা বাজল। রাজনারায়ণ লজ ঘুমের কোলে ঢলে রয়েছে।

বাসব ও শৈবাল ছায়ার মত বাড়ীতে ঢুকল। সঙ্গে কুলদীপ মেহরাও রয়েছেন।

আগের ব্যবস্থামত দরজা খোলাই ছিল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে তিন জনে দোতলায় এল।

আবছা ভাবে তেতলার সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার শেষ প্রান্তে তেতলার সিঁড়ি। সিঁড়ির সামনাসামনি একটা জায়গা বেছে নেওয়া হল। সেখান থেকে দেখা যায় তেতলায় কেউ উঠছে কিংবা নামছে কী না। অথচ ওদের কেউ দেখতে না পায়।

মিনিটের পর মিনিট কেটে চলল। সিঁড়ির দিকে একভাবে তাকিয়ে সকলে।

বারোটা বাজল কোথায়। তারপর সাড়ে বারোটা। একটাও বেজে গেল ক্রমে।

কুলদীপ মেহরা ফিসফিস করে বললেন, আমাদের বোধ হয় পণ্ডশ্রম হল। তু-ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি—

বাসব বলল, সারা রাত বোধ হয় আমাদের এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে। তবে···ওর কথা শেষ হল না। হাল্কা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। কে যেন এগিয়ে আসছে—একটা চলমান ছায়া···দেখা গেল না। সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ছায়াটি দাঁড়াল তেতলার সিঁড়ির মুখে।

এক মুহূর্ত। তারপর উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

মিনিট তুয়েক পার হল।

মিঃ মেহরা ও শৈবালকে নিয়ে বাসব তেতলার দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ির চার পাঁচটা ধাপ পার হয়েছে বোধ হয়—ঠিক সেই সময় রাতের নীরবতাকে চুরমার করে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল—সেই সঙ্গে চাপা আর্তনাদ।

ওরা দ্রুতবেগে ওপরে উঠে চলল। সিঁড়ির ওপরে পৌঁছাবার পূর্বেই অপর দিক থেকে সবেগে কে একজন এসে পড়ল ওদের ওপর। শৈবাল ছিটকে পড়ল একধারে। মিঃ মেহরা ও বাসবকে কোন রকমে রেলিং ধরে নিজেদের সামলাতে হল। অসম্ভব দ্রুত-গতিতে ধাপে ধাপে নেমে চলেছে আগন্তুক তখন। মিঃ মেহরা

ধাবিত হলেন তার পিছনে।

বাসব পকেট থেকে টর্চ বার করে সিঁড়ির রেলিংএ ভর দিয়ে নীচের দিকে কয়েকবার আলো ফেলল। তারপর সেও নীচে নেমে গেল।

একতলার বারান্দায় ঝটাপটি চলেছে। গজ-কচ্ছপের গুঁতো-গুঁতি হচ্ছে যেন। প্রথমে মিঃ মেহরা, তারপর বাসব ও সবশেষে শৈবাল ঘটনাস্থলে এল।

টর্চের তীব্র আলোয় দেখা গেল রঞ্জন মুখার্জ্জী ও শ্রীনাথবাবুর মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে। বাসব এগিয়ে গিয়ে ওঁদের ছাড়িয়ে দিল।

শ্রীনাথবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আপনার কথামত আমি সিঁড়ির নীচেই অপেক্ষা করছিলাম। গুলির আওয়াজ পেয়ে ওপরে উঠতে যাব, এমন সময় দেখি রঞ্জনবাবু পালিয়ে যাচ্ছেন। তাই—

—আমার কথামত কাজ করে ভালই করেছেন শ্রীনাথবাবু। তারপর মিঃ মুখার্জ্জী?

মিঃ মেহরা রঞ্জন মুখার্জ্জীর হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে দিয়েছিলেন ততক্ষণে। নির্বাক রঞ্জন তখন মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

—কিন্তু আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করা চলবে না।—বাসব বলল, আসুন, তেতলায়।

মিঃ মেহরা হুইশিল বাজালেন। বাইরে অপেক্ষমান দুজন কনস্টেবল ছুটে এল। তাদের হেপাজতে রঞ্জনবাবুকে দিয়ে তিনজনে তেতলার দিকে ধাবিত হলেন।

গুলির আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সকলেই নিজের নিজের চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

তেতলায় এসেই একটা খোলা দরজার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে মিঃ মেহরা বললেন, মনে হচ্ছে ওই ঘরে।

ঘর থেকে একটা ফিকে আলোর আভা বেরুচ্ছে। চম্পার ঘর

ওটি। দোতলায় ওর ঘরে রাধা খুন হওয়ার পর, ওকে তেতলার এই ঘরে চলে আসতে হয়েছে। কারণ দোতলার ঘরটি এখন পুলিসের হাতে।

ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা গেল না। ঘরের আলোটা অত্যন্ত হাল্কা। টর্চের আলোয় সুইচ বোর্ড খুঁজে নিয়ে বড় আলোটা জ্বালল বাসব।

তীব্র আলোয় ভরে উঠল ঘরখানা।

কিন্তু চম্পা কোথায়? বিছানা খালি। পাশের বালিশটা গুঁজড়ে পড়ে আছে এক ধারে। মেঝের জায়গায় জায়গায় রক্তের ছাপ। ওধারের একটা দরজার পাল্লায় রক্ত লেগে রয়েছে।

বাসব পাশের বালিশটা পরীক্ষা করল প্রথমে। তারপর রক্ত-মাখা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ওপাশে ফালি বারান্দা একটা। বারান্দার সঙ্গে সংযুক্ত স্পাইরেলের সিঁড়ি। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নীচে নেমে গেছে।

উদ্বিগ্ন ভাবে মিঃ মেহ্‌রা বললেন, মিস্ চ্যাটার্জ্জী কোথায়?

অন্যমনস্ক ভাবে বাসব বলল, আমি জানতাম না এধারে একটা স্পাইরেলের সিঁড়িও আ:ছ। আসুন, দেখা যাক—

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নীচে নেমে এল। শৈবাল, মিঃ মেহ্‌রা ও শ্রীনাথবাবুও ওর পিছনে পিছনে বাগানে এলেন।

সারভেণ্ট কোয়ার্টারের কাছে এসে থামল বাসব।

কয়েকটা ঘরের সামনে খাটিয়া পেতে কয়েকজন ঘুমাচ্ছে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত চাকরদের কানে গুলির আওয়াজ এসে পৌঁছায়নি। তারা পরম নিশ্চিন্ততায় ঘুমাচ্ছে।

বাসব বন্ধ ঘরগুলোর দিকে এল।

একটা ঘরের ভেজান দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

একটু চাপ দিতেই একটা পাল্লা সরে গেল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে।

অত্যন্ত মোলায়েম আলোয় ঘরখানা কোন রকমে আলোকিত।
কে একজন দরজার দিকে পিছন করে, খালি গায়ে কী করছে।

পাল্লা সরে যাওয়ার সময় একটু শব্দ হয়েছিল বোধহয়। বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়াল লোকটি। ট্রাউজারের পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে কিছু একটা বার করে আনবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই ঝটিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বাসব বলল, আমরাও সশস্ত্র। পকেট থেকে হাতটা বার করে আনুন। অনেক রাজা উজির মেরেও, শেষ পর্যন্ত বোড়ের চালেই মাৎ হয়ে গেলেন মিঃ মিত্র।

মিঃ মেহরা শৈবাল ও শ্রীনাথবাবুকে নিয়ে ঘরের মধ্যে এলেন।

বাসব বলল, মিঃ মেহরা, আসামী আমার সামনে। তিনটি হত্যাকাণ্ডের একমাত্র হত্যাকারী মহীতোষ মিত্রকে আপনি গ্রেপ্তার করতে পারেন।

মহীতোষ মিত্র পকেট থেকে হাত বার করে আনলেন। তাঁর বাঁ কাঁধের এক পাশ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। হিংস্র চোখে সকলের দিকে তাকালেন তিনি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, আমি যে খুনগুলো করেছি তা প্রমাণ করতে পারবেন?

—পারব বৈকী। প্রমাণ একটা নয়, একটার পর একটা আছে মিঃ মিত্র। সর্বাধুনিক হল, আপনি এই কিছুক্ষণ আগে চম্পা দেবীকে খুন করতে গিয়ে, সাইলেন্সারের যে গুলিটি পাশের বালিশের ওপর খরচ করেছেন—তা আমরা খুঁজে পাবই। আর রিভলবারটা আপনার পকেটে রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, হত্যা করা এবং হত্যা করতে গিয়ে ফস্কে যাওয়ার মধ্যে শাস্তির বিশেষ তারতম্য হয় না। তাছাড়া রঞ্জনবাবু একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। অন স্পট তিনি আপনাকে আহত করেছেন।

হিংস্র চোখ দুটো নিষ্প্রভ হয়ে গেল মহীতোষ মিত্রের।

চোয়াল ঝুলে পড়ল। তিনি অসহায় ভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

॥ তের ॥

পরের দিন।

কুলদীপ মেহরাকে আজই বিস্তৃত ভাবে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে মুঙ্গের থেকে বিদায় নিচ্ছে বাসব ও শৈবাল। ট্রেন ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারকে ওরা প্রেফার করল না। ফিরে চলেছে আপার ইণ্ডিয়াতেই।

স্টেশানে ওদের তুলে দিতে এসেছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, রামনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ, কুলদীপ মেহরা ও শৈবালের শ্বশুর মশাই। সুপর্ণ আর চম্পা ও অবশ্য আছে। তবে ওরা সি অফ্ করতে আসেনি, ওরাও চলেছে বাসব ও শৈবালের সঙ্গে কলকাতায়। ট্রেন ছেড়ে দিল যথা সময়ে। হাত নেড়ে এবং শুভেচ্ছাসূচক বার্তা বিনিময় করে উভয় পক্ষই বিদায় নিলেন উভয় পক্ষের কাছে।

দরজার কাছ থেকে সরে এসে বার্থের ওপর বসল বাসব।

ফোর বার্থ ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। যাত্রীও চারজন।

বাসব একটা সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, সুপর্ণবাবু, বিশেষ দিনটিতে যেন আমাদের দুজনকে ভুলবেন না।

মৃদু হেসে সুপর্ণ বলল, ভুললে আমাদের নরকেও স্থান হবে না বাসববাবু। এত বড় বিপদ থেকে আপনি ছাড়া আমাকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারত বলে আমি বিশ্বাস করি না।

চম্পা বলল, এখনও আমার কাছে সমস্ত ধাঁধা। মহীতোষ-বাবুর মত লোক যে এরকম নিষ্ঠুর প্রকৃতির হতে পারে, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। কি ভাবে আপনি তাঁকে সন্দেহ করলেন মিঃ ব্যানার্জ্জী?

—প্রথমেই কী বুঝতে পারছিলাম! পরে…

—ওভাবে নয়। প্রথম থেকে আমাদের সমস্ত কিছু বলুন? সুপর্ণ বলল।

বাসব সিগারেটে কয়েকবার টান দিয়ে আরম্ভ করল,—আমি এসে এখানে সমস্ত কিছু দেখে শুনে নেবার পর, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কৃষ্ণা দেবী হত হলেন কেন। তাঁকে হত্যা করে হত্যাকারীর লাভ কি? অনেকেরই ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু কাউকেই প্রকৃত হত্যাকারী বলে ধরতে পারছিলাম না। তখন প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করতে লাগলাম। যাতে প্রকাশ পেল, রঞ্জন মুখার্জ্জী মিত্রানী দেবীকে ভালবাসেন এবং কোকো মিক্সারের সিগারেট স্মোক করেন। নেশাটি তিনি কী ভাবে ধরেছিলেন তার ইতিহাস আপনারা শুনেছেন। তাঁর হাবভাব অত্যন্ত সন্দেহজনক। তবু আমি তাঁকে অপরাধীর লিস্ট থেকে বাদ দিয়েছিলাম। কারণ প্রথম সাক্ষাতেই চম্পা দেবীর সঙ্গে তিনি যে ভাবে কথা বলেছিলেন বা চম্পা দেবীর ঘরের কাচ ভাঙ্গার কথাটা যে ভাবে বললেন আমায়, তাতে ওই রকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। হত্যাকারী সেধে নিজে থেকে এভাবে কথা বলতে পারে না। দ্বিতীয় নম্বর রামনারায়ণবাবু, তিনি ওষুধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ওটা না-কী তার হবি। এ বাড়ীতে ডাক্তারী-জ্ঞান অর্থাৎ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ক্লোরিন গ্যাসে মৃত্যু কী ভাবে হবে এবং ওই গ্যাস কী করে সংগৃহীত হয়, সে সম্বন্ধে একমাত্র তাঁরই জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকেও সন্দেহ করা যায় না। প্রথম কারণ, তিনি ক্লোরিন গ্যাস সম্বন্ধে যে কথা আমায় বলেন তা হত্যাকারীর পক্ষে কখনই আমাকে বলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় রাজ-নারায়ণের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে—এ কথা আমি তাঁর মুখেই প্রথম শুনি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, যে লোকের স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হয়েছে সকলে জানে, তাকে হত্যাকাণ্ড বলা নিশ্চয়ই হত্যাকারীর অভিপ্রেত হবে না। তাছাড়া এ সমস্ত বলে তিনি যেন আমাকে সাহায্যই করতে চাইলেন। কাজেই—।

তৃতীয় নম্বর ইন্দ্রনারায়ণ। তাঁর ব্যবহারে যদিও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি, তবে ধরে নেওয়া যায় চম্পা দেবীর সম্পত্তি পাওয়াতে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন। এতে তাঁকে কৃষ্ণা দেবীর হত্যা-কারী বলে সন্দেহ করা যায় না। মিত্রানী দেবীকে আমি এমনি বাদ দিলাম। জয়ন্ত চৌধুরীর ব্যবহারে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। শ্রীনাথ কবিতা লেখেন। তাঁরই লেখা কবিতা চম্পা দেবী উপহার পেয়েছেন। কেন? কেনর উত্তরটা অবশ্য পরে পেয়েছিলাম। পরে সে কথা বলছি। অবশ্য সুপর্ণবাবুকে আমি কখনই সন্দেহ করিনি। কৃষ্ণা দেবীকে হত্যা করার তাঁর কোনই স্বার্থ থাকতে পারে না। বরং এটা বোকামীর পরিচায়ক। রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব যাঁর প্রায় করায়ত্তে (বাসব সুপর্ণ ও চম্পার দিকে তাকিয়ে হাসল) তিনি এরকম কাণ্ড করতে যাবেন কেন! দুর্ঘটনার স্থলে তাঁর কাফলিঙ্ক পেয়ে যাওয়াটাকে আমি মোটেই গুরুত্ব দিইনি। হত্যাকারী সুপর্ণবাবুকে ফাঁসাবার জন্যে এটা করেছে সহজেই বুঝতে পারা যায়। বাসব থামল।

সিগারেটের টুকরোটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। শৈবাল, সুপর্ণ ও চম্পা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে।

বাসব আবার আরম্ভ করল, মহীতোষ মিত্রকে সন্দেহ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি এটর্নি এবং বাড়ীর দীর্ঘ দিনের বন্ধু। আর সবচেয়ে বড় কথা তিনিই চম্পা দেবীকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার চিন্তা তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল, কৃষ্ণা দেবীকে হত্যা করা হল কেন, এ বিষয়ে। রাধা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধরতে পারলাম প্রকৃত ব্যাপারটা। আসলে হত্যাকারী চম্পাকে মারতে চায় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুবারই তার টার্গেট মিশ হয়েছে। প্রথম-বার একই ধরনের শাড়ী পরে থাকার দরুন অন্ধকারে হত্যাকারীর ভুল হয়েছিল। এখানে মতভেদের প্রশ্ন উঠতে পারে। দ্বিতীয় বার মতভেদের কোন প্রশ্নই নেই—হত্যাকারীর যদি রাধাকে হত্যা করারই উদ্দেশ্য ছিল, তবে সে চম্পা দেবীর সোরাইয়ে সায়নাইড

মিশিয়ে রাখবে কেন? ওই সোরাই থেকে রাধার জল খাওয়ার ৯০ পারসেন্ট চান্স নেই। অথচ সেন্ট-পারসেন্ট চম্পা দেবীর ওই সোরাই থেকে জল খাওয়ার চান্স রয়েছে। আমি চম্পা দেবীকে হত্যা করার বিষয় স্থির নিশ্চিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—এতে হত্যাকারীর কি লাভ? তিনি মারা গেলে উইল থেকে ব্যক্তি বিশেষের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমস্ত টাকা যাবে রায়নারায়ণ ট্রাস্টে। রাধা মারা যাওয়ার পর আমি যখন ঘরখানা পরীক্ষা করছি তখন চোখে পড়ল সোরাইয়ের স্ট্যাণ্ডটার ওপর কালো সিল্কের খানিকটা থ্রেড পড়ে রয়েছে। আমি ঘর থেকে নীচে নেমে এলাম। সেখানে রামনারায়ণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি আগের দিন রাত্রে জানতে পেরেছিলাম ক্লোরিন গ্যাসের ফ্ল্যাস্ক দুটো রামনারায়ণের। এই তথ্য জানবার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আমি কয়েকদিন রাত্রে রাজনারায়ণ লজের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন রাত্রে বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছি, চোখে পড়ল গেটের পাশে একটা সাইকেল দাঁড় করান। সাত-পাঁচ ভেবে তার টায়ারটা সেফটিপিন দিয়ে নষ্ট করে আমি গেটের অপর পারে লুকিয়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে, দুজন লোক বাড়ীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিনতে কষ্ট হল না। একজন রামনারায়ণ, অপর জন ডাঃ রায়। আমি আগেই গিয়ে ডাক্তার রায়ের আস্তানায় ওত পেতে রইলাম। তারপর তাঁর কাছ থেকে কথা বার করতে কষ্ট হল না। তিনি যা বললেন, তার সার-মর্ম হল, বছর দুয়েক আগে রামনারায়ণ নিজের রিসার্চের জন্যে লেখাপড়া করে ৭০ হাজার টাকা নেন। তিনি যা করতে চাইছেন, তা সফল হলে অর্ধেক অংশীদার ডাঃ রায় হবেন। কাজ সবে খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় গোলমাল বাধল। দুটো ক্লোরিন গ্যাসের ফ্ল্যাস্ক চুরি গেল। তারপরই রাজনারায়ণ মারা গেলেন। ডাঃ রায় সত্যি সত্যিই প্রথমে ধরতে পারেননি তিনি খুন হয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণা দেবী মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন, চুরি

খাওয়া ফ্ল্যাস্ক দুটোর সাহায্যেই দুজনের প্রাণ গেছে। তিনি ভয় পেলেন। কারণ, তাঁরই টাকায় ক্লোরিন্ গ্যাস তৈরী হয়েছে। টাকা তিনি আগে থেকেই ফেরত চাইছিলেন। রামনারায়ণের আশা ছিল, উইলে দাদা তাঁকে বহু টাকা দিয়ে যাবেন। কিন্তু তা হল না। মহা চিন্তায় পড়লেন রামনারায়ণ। সেদিন এইরকমই একটা তাগাদা দিতে রামনারায়ণের কাছে গিয়েছিলেন ডাঃ রায়।

বাসব চুপ করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করল, যা বলছিলাম, ওপর থেকে নেমে এসে রামনারায়ণের সঙ্গে কথা হচ্ছে, এমন সময় সেখানে এলেন জয়ন্ত চৌধুরী ও মহীতোষ মিত্র। সেই মুহূর্তে আমার এক বিরাট প্রবলেম প্রায় সল্‌ভ হয়ে গেল। মহীতোষ মিত্রের নাকে আঁটা প্যাঁসনের সঙ্গে লাগান লম্বা কালো সুতোগুলো আমায় এক বিশেষ পথের সন্ধান দিল। আমি এইমাত্র সোরাইয়ের স্ট্যাণ্ডের ওপর থেকে যে কালো সুতোটা পেয়েছি, তা কি এই প্যাঁসনের সুতোগুলোরই অন্যতম? পোস্ট অফিস অবধি মহীতোষ মিত্র আমার সঙ্গে গেলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম, যারা সম্পত্তি পেয়েছে তাদের মধ্যে কেউ উইল করলে তা ভ্যালিড হবে কী না। তিনি বললেন, হবে। কিন্তু মনে মনে বেশ চঞ্চল হলেন। কারণ এ সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি। এখন সত্যি যদি চম্পা দেবী কাউকে উইল করে দেন নিজের সম্পত্তি, তাহলে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাবে। একসময় তিনি তাঁর চশমাটা দেখালেন। এক সাইডের কাচ ফাটা। রাত্রে না কী বালিশের চাপে ফেটেছে। আমি কিন্তু তখুনি দেখে নিলাম ভাল করে প্যাঁসনের সঙ্গে যে থ্রেডযুক্ত রয়েছে, তার সঙ্গে আমার সুতোটার কোনই পার্থক্য নেই। তবে কী মহীতোষ মিত্রই হত্যাকারী! কিন্তু কেন? কেনর উত্তরটা পাওয়া গেল যখন জানতে পারলাম, রামনারায়ণ ট্রাস্টের উনিই চেয়ারম্যান, অবশ্যই এরপর আমার অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না. ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরা নিশ্চয়ই তাঁরই নিজের লোক এবং এই রকম ট্রাস্টের

তছ্‌বিল যে কোন ভাবে তছরূপ করবার দৃষ্টান্ত বিশ্বের সমস্ত দেশেই প্রচুর আছে। আরেকটা বিষয় আমি তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। মোটরের নানাস্থান থেকে আমি দুটো হাতের ছাপ সংগ্রহ করেছিলাম। চম্পা দেবীকে মহীতোষবাবু রাজনারায়ণের যে চিঠিখানা দিয়েছিলেন, তা থেকেও হাতের ছাপ তুললাম। খামের ওপর দুজনের হাতের ছাপ থাকাই স্বাভাবিক—মহীতোষ মিত্র ও চম্পা দেবীর। চারটে হাতের ছাপের মধ্যে একটা কমন পাওয়া গেল। স্বাভাবিক ভাবেই সেটা মহীতোষ মিত্রর। কারণ চম্পা দেবী গাড়ী চালাতে পারেন না, গাড়ীর ধারে কাছে যাননি। আর রঞ্জন মুখার্জ্জী সম্প্রতি রাজনারায়ণের খামটা হাতে নেননি। তারপর সারভেণ্ট কোয়ার্টারের দরজার ওপর আবার দুটো হাতের ছাপ পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটা রাধার। অন্যটা আবার মহীতোষ মিত্রর সঙ্গে মিল হল। আশা করি আপনারা আমায় ফলো করেছেন?

তিনজনেই ঘাড় নাড়লেন।

—এবার আমি মহীতোষ মিত্রকে হাতেনাতে ধরবার পরিকল্পনা করলাম। চম্পা দেবী আমাকে সাহায্য করলেন। আসলে সেদিন সকলকে ডাকিয়ে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল সময় বুঝে চম্পা দেবী নিজের উইলের কথা বলবেন। যাতে হত্যাকারী কোনমতেই বুঝতে না পারে যে তার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমার পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হয়নি, তা আপনারা দেখেছেন। মহীতোষ মিত্র চম্পা দেবীর উইল পাল্টাবার কথা শুনেই ঠিক করে নিলেন, রাত্রেই তিনি কাজ শেষ করবেন। অবশ্য আমি এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি, চম্পা দেবীর অভিনয় হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের মত। তারপর যা হয়েছে আপনারা জানেনই।

শৈবাল বলল, রঞ্জনবাবু মহীতোষবাবুকে গুলি করতে গেলেন কেন?

—কারণ, তিনি চম্পা দেবীর বডিগার্ড ছিলেন। বুঝতে পারলে

না? তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সেদিন সকলের সামনে রঞ্জনবাবু আমায় বলেছিলেন, কতকগুলো কথা তিনি এতগুলো লোকের সামনে বলতে পারবেন না। পরে আমাকে জানাবেন। আমার সঙ্গে পরে তাঁর কথা হয়েছিল। রঞ্জনবাবুর চরম দুরবস্থার দিনে রাজনারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রঞ্জনবাবু অকৃতজ্ঞ নন। যদিও একান্তে সুপর্ণবাবু সেক্রেটারী নিযুক্ত হওয়ার একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তবু তিনি রাজনারায়ণকে অন্ধের মত ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রাজনারায়ণ, দেবনারায়ণের মৃত্যুর পরও চেষ্টা করেছিলেন পুত্রবধূ যাতে চম্পাকে নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। এদিকে তাঁর নাতনীটি কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হবে, এতেও তিনি স্থির থাকতে পারছিলেন না। তাই রঞ্জনবাবুর সাহায্যে চম্পা দেবীর নানারকম চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে থাকলেন। তিনি থ্রম্বোসিসের রুগী ছিলেন। এদিকে বয়সও বেশ হয়ে গেছে—কখন আছেন কখন নেই—এটর্নি ডেকে উইল করে ফেললেন এবং চম্পা দেবীকে সম্পত্তির অর্ধেক দিলেন। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল অপরিচিত নাতনীটির এই বিরাট সম্পত্তি পাওয়াটা অনেকেই ভাল চোখে দেখবেন না। হয়তো কোন রকম বিপদ হতে পারে—এসব সাত-পাঁচ ভেবে তিনি রঞ্জন মুখার্জ্জীকে নির্দেশ দেন যে, তিনি মারা যাওয়ার পর চম্পা দেবীর সঙ্গে সুপর্ণবাবুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে চোখে চোখে রাখতে। রঞ্জনবাবু অক্ষরে অক্ষরে সে আদেশ পালন করেছেন। চম্পা দেবী এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। রাতে-বেরাতে তিনি চম্পা দেবীর ঘরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতেন। রাজনারায়ণের রিভলবারটা তাঁর কাছে ছিল। রঞ্জনবাবুও বুঝতে পেরেছিলেন হত্যাকারী চম্পা দেবীকে হত্যা করতে চায়। দোতলার ঘর বদল করে চম্পা দেবী যখন তেতলায় গেলেন, রঞ্জন মুখার্জ্জী তখন তেতলায় নিজের ডিউটি পার্মানেন্ট করলেন। যথা নিয়মে মহীতোষ মিত্র আমার টোপ

গিলে চম্পা দেবীকে হত্যা করতে গেলেন। মিঃ মিত্র চম্পা দেবীর ঘরে ঢোকার পরই রঞ্জনবাবু তাঁকে আহত করেন। অবশ্য তার আগেই মহীতোষ মিত্র নিজের সাইলেন্সার দিয়ে চম্পা দেবী মনে করে বালিশে গুলি করেন।

চম্পা প্রশ্ন করল, কিন্তু আমাকেই বা তিনি মারতে চেয়েছিলেন কেন?

—কারণ আপনার নগদ টাকা ও সম্পত্তির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। আপনাকে খুন করতে পারলেই একটা ধন-ভাণ্ডার হাতে আসার সম্ভাবনা।

—আচ্ছা, সেই অদ্ভুত কবিতাটা আমার বিছানায় রেখে এসেছিল কে? চম্পা আবার প্রশ্ন করল।

—এও রঞ্জন মুখার্জ্জীর কাজ। তিনি শ্রীনাথবাবুর কবিতার খাতা থেকে কবিতাটা ছিঁড়ে রেখে এসেছিলেন।

—কেন?

—ওই কাচ ভাঙ্গা সংক্রান্ত ব্যাপারের পর তাঁর ধারণা হয়, আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আপনার বিপদ আসতে পারে। ওই অদ্ভুত কবিতাটা আপনার চিন্তার খোরাক হবে—আপনি ভয় পাবেন। তখন মিত্রানী দেবী বা চারুলতা দেবীর ঘরে আপনি রাত কাটাতে বাধ্য হবেন। এখন শুনুন ঘটনাটা কী ভাবে গড়ে ওঠে। রাজনারায়ণ উইল করলেন। মহীতোষবাবুর পরামর্শে ট্রাস্ট গঠন করলেন এবং মনে হয় মহীতোষের অনুরোধে তাঁকেই চেয়ারম্যান করলেন। নিজের বিপদও রাজনারায়ণ ডেকে আনলেন ওই সঙ্গে। উইলের কোন কথাই মিঃ মিত্রর অজানা থাকার কথা নয়। তিনি ভেবে দেখলেন, চম্পা দেবী বিরাট সম্পত্তি হাতে পাচ্ছেন। তাঁকে যদি হত্যা করা যায়, লাখ লাখ টাকা ট্রাস্টের ফণ্ডে আসবে। ট্রাস্টের ফণ্ডে আসা মানেই তাঁর হাতের মুঠোয় আসা। অথচ কেউই তাঁকে হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করবে না। পুলিস বাড়ীর কাউকে সন্দেহ করবে। চম্পা দেবীর এই উড়ে এসে জুড়ে বসায়

সকলেই অসন্তুষ্ট। কাজেই—। পরিকল্পনা ঠিক করে প্রথমে তিনি ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে রাজনারায়ণকে হত্যা করলেন। মহীতোষ মিত্রের রাজনারায়ণ লজে অবাধ গতি—গ্যাস ফ্ল্যাস্ক ছুটো রামনারায়ণের ঘর থেকে সরিয়ে আনতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। কিন্তু চম্পা দেবীকে হত্যা করতে গিয়ে তিনি অকৃতকার্য হলেন। এদিকে সুপর্ণবাবু তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই আবার তাঁর প্ল্যান হল দ্বিমুখী। সুপর্ণবাবুকে যে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেখানে একটা সোরাই ছিল—তার থেকে তিনি জল খেতেন। তাঁর হাতের ছাপ সোরাইয়ের গায়ে ছিল। মহীতোষ মিত্র রাধার সাহায্যে সেই সোরাইটা চম্পা দেবীর ঘরে রাখল এবং তার জলে পটাশিয়ম সায়নাইড মিশিয়ে দেন। চম্পা দেবী সে সময় ড্রইংরুমে ইন্দ্রবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমার মনে হয়; সোরাইয়ে ঝুঁকে সায়নাইড মেশাবার সময় মিঃ মিত্রর প্যাঁসনে নাক থেকে খসে পড়ে এবং একটা কাচ ফেটে যায়। আর একটা সুতোও ছিঁড়ে যায় সেই সময়। এই সোরাই বদলের উদ্দেশ্য হল চম্পা দেবী মারা গেলেই, সোরাইয়ের গা থেকে হাতের ছাপ পেয়ে পুলিস সুপর্ণবাবুকে আরো দৃঢ় ভাবে সন্দেহ করবে।

চম্পা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, অপূর্ব—।

—কি অপূর্ব মিস্ চ্যাটার্জ্জী?

মৃদু হেসে সুপর্ণ বলল, আপনার প্রতিভা।

শৈবাল বলল, তোমার মাথাটা কিন্তু ভারত সরকার কিনে নিতে পারে।

—কেন, কেন—আমার মাথার অপরাধ?

—উতলা হওয়ানা বৎস। তুমি জানো, একবার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মাথা সরকার কিনতে চেয়েছিল?

—কি রকম—? তিনজনে একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

গল্প বলার ভঙ্গীতে শৈবাল আরম্ভ করল, একদিন রামেন্দ্রসুন্দরের কলকাতার বাড়ীতে তাঁর গ্রামের বিপিন মণ্ডল এসে

উপস্থিত।

রামেন্দ্রসুন্দর মণ্ডলকে প্রশ্ন করলেন, এখন তো ট্রেনের সময় নয়। এলে কি ভাবে?

মণ্ডল বলল, পায়ে পায়ে চলে এলাম বাবু।

—বল কী! এতখানি পথ—তোমার এরকম দুর্বুদ্ধি কেন হল মণ্ডল?

—আজ্ঞে, আপনার একটা খারাপ খবর পেয়ে ট্রেনের কথা আর মনে পড়ল না। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।

বিস্মিত কণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, আমার কি মন্দ খবর তুমি পেলে মণ্ডল?

কিন্তু মণ্ডল আর বলতে চায় না। শেষে অনেক অনুরোধ করার পর সে বলল, আপনার মাথা নাকী-এক লাখটাকায় কিনে নিয়েছে সরকার? ঘি বার করে দেখবে কী আছে মগজে। আমি গেজেট পড়তে না পারলেও, ভালো লোকের কাছে শুনেছি। গেজেটে না-কী খবর বেরিয়েছে।

একথা শুনে রামেন্দ্রসুন্দর একেবারে থ'।

শৈবাল থামতেই সকলে একযোগে হেসে উঠল।

পূর্ণবেগে তখন ছুটে চলেছে ডাউন আপার ইণ্ডিয়া।